


নব মালঞ্চ
প্রবোধকুমার সান্যাল

আষাঢ় ১৩৫৩

প্রকাশ করেছেন
শ্রীরণেন্দ্র কুমার শীল
পর্ণ কুটীর
৬, কামার পাড়া লেন
বরাহনগর

মুদ্রন করেছেন
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদপট শিল্পি
শ্রীগনেশ বসু

প্রচ্ছদপট মুদ্রন
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

দু'টাকা চার আনা

প্রবোধ কুমার সান্যালের অন্যান্য বই—

দেবাত্মা হিমালয়, তুচ্ছ, আঁকাবাঁকা,
হাস্নুবানু, বনহংসী, মহাপ্রস্থানের পথে,
দেশ দেশান্তর, নদ ও নদী,
উত্তরাকাশ, কাদামাটির দুর্গ,
অরণ্যপথ, শ্যামলীর স্বপ্ন,
পুষ্পধনু ইত্যাদি।

এই ছোট উপন্যাসটি কয়েক বছর আগে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়, এবং তখন এর গল্পাংশের সঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনেকটা যোগাযোগ ঘটেছিল। চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ কালে সেই সময়ের প্রয়োজনে আমি এর যে-নামকরণটি করেছিলুম, সেটি তৎকালে আমার পছন্দসই হয়নি। এই গ্রন্থের মূল কাহিনীটি পাঠক সমাজের প্রিয়, সেইজন্যে তার সঙ্গে নূতন শিরোনামটি দেবার সুযোগ পেয়ে আমি খুসী হলুম।

প্রবোধ কুমার সান্যাল

নব মালঞ্চ

গ্রামের নাম চন্দনডাঙ্গা। ছোট গ্রাম—রেল-স্টেশন থেকে অনেক দূরে। সেই গ্রামের যিনি জমিদার তাঁর বালিকা কন্যার নাম সুরবালা। সেই মেয়েটির একটি সহচরী ছিল—তা'র নাম সূর্যমুখী। সূর্যমুখী গরীবের মেয়ে।

পুতুল খেলা নিয়ে দুজনের ভালবাসা হয়, ঝগড়া বাধে, গল্প চলে, —কিন্তু যা কিছুই হয় সবই সূর্যমুখীদের বাড়ীতে। সূর্যমুখীদের বাড়ীটি প্রাচীন। আগে তাদের জমি জায়গা কিছু ছিল, কিন্তু দেনার দায়ে সব গেছে। এখন কষ্টে দিন চলে।

সেদিন দুপুর বেলা দুজনে খেলা করছে। সূর্যমুখী নিজের পুতুলটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে আপন মনেই বল্লে, বাঃ কেমন মানিয়েছে, এবার বল্‌ত? মাথায় সোনার মুকুট, চাঁদের মালা দুল্‌ছে গলায়, এবার ময়ুরপঙ্খী রথে চড়ে যাবি আনন্দ-সরোবরে—

সখীরা যাবে সঙ্গে কেমন?—ইস্ অমনি মেয়ের রাগ হল বুঝি?—আচ্ছা, আচ্ছা, বেশত,—

পাহাড়, পর্ব্বত, নদী পেরিয়ে যাবি অনেক—অনেক-দূরে, নিজের মনে যেতে যেতে দেখবি: সেই এক গভীর বন—সেখানে কাঠ কাটতো এক কাঠুরিয়া—সে ঘুমিয়ে আছে বনে—সোনার স্বপনের মতন তার ঘুম!—রাজপুত্তুরের মতন তার রূপ—তাকে জাগিয়ে তুলবি, তারপর হাসিমুখে তার গলায় মালা দিবি—কেমন?

ওপাশে বসেছিল সুরবালা। সেও নিজের মনে বলে উঠে, কাঠুরিয়া কেন ভাই, আমার এমন রাজপুত্তর—এর গলায় তোর মেয়ে মালা দেবে না?

সূর্যমুখী বলে, না ভাই আমরা গরীব—বড় লোকের বাড়ী মেয়ের বিয়ে আমি দেবোনা।

সুরবালা বলে, কেন শুনি?—

সূর্যমুখী বলে, তোদের যে টাকা বেশী, তোরা নাক উঁচু করে থাকিস।

সুরবালা এগিয়ে এসে একটু উষ্ণকণ্ঠে বলে, বড়লোকের ওপর তোর এত ঘেন্না, আর যদি তোর মেয়ের বিয়ে একদিন হঠাৎ বড়লোকের ঘরেই হয়?

সূর্যমুখী জোর দিয়ে বলে ওঠে, না কিছুতেই না,—আমার মেয়েও হবে না, তার বিয়ের কথাও উঠবে না।

সুরবালা বলে, জোর করে বলছিস, মেয়ে হলে বড় লোকের ঘরে দিবিনে?

সূর্যমুখী বলে, হ্যাঁ, জোর করেই বলছি—

সুরবালা বলে, তবে ভাই কাল থেকে আর তোমাদের বাড়ী আসবো না।—সুধু সুধু বড়লোক বলে গাল দেওয়া—কি দোষ করেছি শুনি?—এই রইলো ভাই তোমার পুতুল—

সূর্যমুখী মুখ ফিরিয়ে বলে, বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলে মান থাকে না তা জানিস?

সুরবালা বলে, আমার বাবা বড়লোক, মা বড়লোক—তাতে আমার কি?

সূর্যমুখী বলে, তুইও বড়লোক হবি একদিন!—

সুরবালা বলে, তা যদি হই হবো—কিন্তু আমরা দুজনে সই পাতিয়েছি—আমি তোর সই—তোর মেয়ে আসবে আমার ছেলের ঘরে—এর মধ্যে বড়লোক আর গরীব লোকের কথা আসে কেন ভাই?—

সূর্যমুখী আপত্তি ক'রে বলে, না ভাই, শকুন্তলা যখন রাজা

দুষ্মন্তের দরবারে গিয়েছিল, রাজা তখন বউ বলে চিনতেই পারেনি —ওতে আমি রাজি নই।

সুরবালা নিশ্বাস ফেলে বলে, বেশ মনে রেখো—সইকে তাড়িয়ে দিলে তুমি! আমিও আড়ি দিয়ে গেলুম!—এই বোলে সে এগোয়। দরজার কাছ থেকে পুনরায় ডাকে, সই—এই সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

সুরবালা এগিয়ে আসে, বলে, হ্যাঁ ভেবে নিয়েছি সব এবার ঠিক হয়েছে, তোরই জিত—বুঝলি?

কি শুনি?

সুরবালা গুছিয়ে বলে, আচ্ছা ধর তোর ছেলে আর আমার মেয়ে—তাহলে আর দোষ নেই ত? এবার বিয়ে দিবিত? কেমন?

সূর্যমুখী একমনে কী যেন ভাবতে থাকে।

সুরবালা বলে, চুপ করে রইলি যে?—মত আছে ত? আমার মেয়ে আর তোর ছেলে!—

সূর্যমুখীর মুখে হাসি ফুটে উঠে, বলে, আমার ছেলেকে কী দিবি বল? অর্দ্ধেক রাজত্ব—হাতীশালা—ঘোড়াশালা—

সুরবালা বলে, কুবেরের ভাণ্ডার—ঢাল—তরোয়াল—সোনার পালঙ্ক—হীরে—জহরৎ—জড়োয়া—কেমন, এবার রাজী ত'? বল মুখ ফুটে।

সূর্যমুখী গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এতে অবিশ্যি রাজী হওয়া যায়!

সুরবালা বলে, বাবারে কী একগুঁয়ে মেয়ে তুই! আমার মাথা-হেঁট করালি তবে ছাড়লি—তুই ঠিক দজ্জাল শাশুড়ী হবি—

সূর্যমুখী বলে, এইনে তোর মেয়ে নে, মালা বদল করে দে—এই ত বিয়ে হয়ে গেল। শিগগীর শাঁক বাজা সুরবালা—

সুরবালা তার খেলা ঘরের শাঁখটি নিয়ে বাজাতে লাগলো।

তারপর অনেককাল চলে গেছে। সুরবালা আর সূর্য্যমুখী উভয়ের বিয়ের পর কে কোথায় চ'লে গেছে তা'র ঠিক নেই। সুরবালা এখন বড়লোকের বৌ। তার একটি মেয়ে হয়েছে বছর সাতেক আগে। সেদিন তাদের বাড়ীতে তা'র বালিকাকন্যার জন্মতিথি উপলক্ষে মস্ত ঘটা। চারিদিক থেকে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা এসেছেন। এখানে ওখানে জটলা। গুঞ্জনরত জনতা। ওদের মধ্যে সমাগত দুটি লোক বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিল। একজন বললে, আদিখ্যেতা—এ যা দেখছো এসবই আদিখ্যেতা।

আদিখ্যেতা করবে না কেন বলো? জমীদারের একটি মাত্র মেয়ে—তার জন্মতিথি! আদিখ্যেতা করবে না কেন শুনি?

তা যা বলেছ! এত আর তোমার আমার ঘরের মেয়ে নয় যে কন্যাদায়ে কপাল চাপড়াবো।

অন্দর মহলেও সমান অবস্থা। ওপাশে কয়েকটি স্ত্রীলোক আনাগোনার পথে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছে। এ আর এমন কী ঘটা দেখছ। মনে আছে আমার মামাতো ননদের ভাসুরঝির ভাতের ঘটা?—বল্ না রে—

অপর জন বলে, বলতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়। ঠাকুর দেবতা সাক্ষী ছিল!

জন দুই স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে বলে, কি--কি—কি রে?

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি বলে, তবে শোন্ ভাই বলি। ঘটার চোটে মেঘ ডেকে উঠলো!

—ওমা তাই নাকি?

—হ্যাঁলো, হ্যাঁ। তা'র কাছে তোদের এই ঘটা চাঁদের তুল্য জোনাকী!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। কেউ বোধ হয় আসছে।

—ওমা, ঠ্যালা মেরে যাও কেন গা? অংখারে চোখে দেখতেও পাও না! তোমরা না হয় বড়লোক, আমরাও বিনি নেমন্তনে আসিনি!—পরের গয়নায় বড়মান্‌ষি....সিড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি।

অলঙ্কার পরা স্ত্রীলোকটি কটাক্ষে একবার তাকিয়ে ভিতর দিকে চ'লে গেল।

ভিতরে যেখানে আয়োজন চলেছে সেখানেও বহুলোকের ভীড়। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই এসে উপস্থিত। ভিতর থেকে একটি মেয়ে আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁ মা, তুমি যে বললে, এখানে এলেই পানতুয়া দেবে?

দাঁতে দাঁত চেপে পুঁটির মা বলে, কেবল খাই খাই! বলছিনা একটু সবুর কর!—এই বলে মেয়েটাকে একটা ঝাঁকুনি দেয়।

এক ঝোড়া ফল-পাকড় মাথায় নিয়ে একটি লোক ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললে, ওগো একটু সরো বাপু তোমরা—

আর একজন আসছিল দই ও মিষ্টান্নের ভার নিয়ে। সে এসে ভীড় সরিয়ে এক জায়গায় তার ভার নামালো। এবং তারও পিছনে আর একটি লোক একটি রংচঙে চেঙারীতে একরাশী নানাবিধ খেলনা নিয়ে এসে প্রবেশ করলো। খেলনা দেখে ছোট ছেলে মেয়েরা হৈ চৈ ক'রে উঠলো।

খিড়কির পথ দিয়ে একটি স্ত্রীলোক ভিতরে এসে সবিনয় কুণ্ঠায় এক বর্ষীয়সী মহিলাকে বললে, এটি আমি বৌমার মেয়ের হাতে দিতে এলুম মা—

বর্ষীয়সী মহিলাটি বললেন, আচ্ছা ডেকে দিই। ওরে সুরবালা—তোর মেয়ের জন্যে কি-এনেছে—নে—

সুরবালা দূর থেকেই বললে, ওখানেই রেখে যাও না বাপু।

একটি মেয়ে তা'র জবাব শুনে তখনই বললে, ওমা দেমাক ছ্যাখো—বড়লোকের বউ বলে—

এমনি সময়ে সেই সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকটি ভিতরে এলেন। এবাড়ীর বৌ সুরবালা তা'কে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, এসো পোদ্দার গিন্নি···এত দেরী যে ?

পোদ্দার গিন্নি বললে, আর বলো কেন দিদি ? লোহার সিন্দুকের চাবিটা-খুঁজে পাচ্ছিলুম না। পরের গয়না নিয়ে কারবার কিনা—

যাকে উপলক্ষ করে আজকের এ অনুষ্ঠান, এত আয়োজন—সুরবালার সেই মেয়েকে তার পিশিমা ওধারে খাওয়াতে বসেছেন। সুরবালার মেয়ে ভোজনের আসন থেকে ব'লে উঠলো, না, না, আর আমি খেতে পারবো না! এত কি খাওয়া যায় ?—

পিসিমা বললে, লক্ষ্মীটি, এই ক্ষীরটুকু মুখে দাও মা ?

সুরবালা হাসিমুখে বলে, ও সব খেয়ে খেয়ে আমার মেয়ের মুখে অরুচি, পিসিমা!

পিসিমা বললে, তা হোক্, আজ একটু মুখে দিতে হয়! এসো মা লক্ষ্মীটি, মুখে দাও!—

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলে, না!—এই বলে সে দাঁড়িয়ে ওঠে, খালি ক্ষীর, আর সর, আর সন্দেশ! ও আর আমি খাবো না—এই ব'লে সে একদিকে ছুটে চ'লে যায়।

পিসিমা হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

অনেককাল পরে সূর্যমুখীর খোঁজ পাওয়া যায়। একটি গরীব পাত্রের সঙ্গে তা'র বিয়ে হয়। কিন্তু তার স্বামী যখন সবেমাত্র ভাগ্য পরিবর্ত্তন ক'রে উঠছে, এমন সময় একদা কলেরারোগে তার মৃত্যু ঘটলো। সূর্যমুখী অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে তা'র একটিমাত্র ছেলেকে নিয়ে দিন কাটায়। ছেলেটির নাম মানিক। মানিকের প্রায় দশ-বছর বয়স।

একদিন খেতে বসে মানিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, না, কিছুতেই খাবোনা, ও আমি কিছুতেই খেতে পারবো না, তোমাকে বলে দিলুম—এই ব'লে ভাতের থালাটা সে ছুঁড়ে দেয়।

সূর্যমুখী বলে, ছি মানিক, কত কষ্টে রাঁধলুম, খেয়ে নাও বাবা, লক্ষ্মীটি।

মাণিক বলে, ছাই রাঁধলে, রাঁধলে কি শুনি? কই এত' সবই ফ্যাণ—এর মধ্যে ভাত কোথায়, দেখাও দেখি?

সূর্যমুখী বলে, ওমা, কী অবুছ তুই মাণিক? তোকে দেখিয়ে না তখন চা'ল দিলুম হাঁড়িতে?

মাণিক বলে, কই দেখালে? সে কি চা'ল? সে ত ক্ষুদ। আমি কি গরু যে ক্ষুদ সেদ্ধ খাবো?—আর এটা কি শুনি? এই ঘাস চচ্চড়ি খাবে কে? যত রাজ্যের কুটনোর খোসা, আর মটর শাকের ডাঁটা—এ মানুষে খায়?

নিশ্বাস ফেলে সূর্যমুখী বলে,—আর কোথায় কি পাবো বাবা!—আজকের দিনটাও চললো, কাল থেকে আর চলবে না।

মাণিক বলে, না, চলবে না! না চললে তুমি কি করবে শুনি? কই তুমি কি রাঁধবে নিজের জন্যে, দেখি?

সূর্যমুখী বলে, আচ্ছা, তা'র জন্যে তোর ভাবনা নেই, তুই খা!—বিধবার রান্না কি দেখতে আছে, বাবা—ওতে যে ঠাকুরের ভোগ হয়!

মাণিক কী যেন কতক্ষণ চিন্তা করে! তারপর ডাকে, মা?

সূর্যমুখী বলে, কি বল্?

মাণিক বলে, তুমি আর ক'দিন উপোস করবে শুনি?

সূর্যমুখী বলে, আ বোকা ছেলে! জানিসনে, তোর কল্যাণে আমাকে উপোস করিতে হয়?

মাণিক বলে সে ত' ষষ্ঠীর দিনে তুমি না খেয়ে থাকো!

ছেলে মানুষ, কিছুই জানিস নে তুই। ষষ্ঠি, মহাসপ্তমী, অশোক অষ্টমী, রাম নবমী, ভীম একাদশী—কতদিন উপোস করতে হয়, বাবা!

তুমি মিছে কথা বলছ কেন মা?

সূর্যমুখী বলে, বেশ ত, তুই যখন বড় হয়ে বলবি, তোমাকে আর উপোস করতে দেবো না মা, সেদিন থেকে আর উপোস করবো না!

মাণিক বলে, আমি কিন্তু বলে রাখলুম মা, বাবুদের পেয়াদা যদি এসে আবার খাজনা চেয়ে তোমাকে কিছু বলে, আমি ঠিকবলছি—কাঁকর ছুঁড়ে ওর চোখ কানা ক'রে দেবো। আমাকে চেনে না!

সূর্যমুখী বলে, চুপ, চুপ, ওকথা বলতে নেই মাণিক। এখানে থাকাও আর চলছে না, তোকে নিয়ে এখান থেকে কবে যাব তাই ভাবছি। ওদের সঙ্গে যেন আর ঝগড়া করতে যাসনে, বাবা।

মাণিক চেঁচিয়ে বলে, তাই বলে তোমাকে অপমান ক'রে যাবে মা?

—সূর্যমুখী যেন একটু অস্থিরভাবে বলে, তুই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ, তাহলে আর আমাকে কেউ অপমান করবে না!

মাণিক বলে, আচ্ছা মা—

সূর্যমুখী বলে, কেন রে?

মাণিক বলে—আজ তোমার কিসের উপোস মা?

সূর্যমুখী বলে, আজ—? বলছি—দাঁড়া—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ায়, মনে মনে কী যেন খোঁজে, তারপর বলে, কি যেন একটা—ঠিক মনে পড়চেনা—তুই খেয়ে নে, মাণিক। মাণিক এতক্ষণে সমস্তটাই বুঝতে পারে। দেখতে দেখতে তা'র চোখে জল নেমে আসে। সূর্যমুখীও অলক্ষে চোখের জল মোছে।

এমন সময় বাইরে থেকে কার যেন মোটা গলার আওয়াজ, এবং কয়েকটি বালক বালিকার কলরব শোনা যায়।

সূর্যমুখী দরজার দিকে তাকায়।

কই গো, বৌমা? বৌমা কোথায় গো? বলতে বলতে একটি বুড়ো লোক একেবারে বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়ালো। সূর্যমুখী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে। লোকটি বলে—এই যে বৌমা, এই তোমাকেই খুঁজছিলাম। আর বলো কেন, তোমার ভরসাতেই আসা! চিনতে পারলে না ত? তা পারবে কেন! কোনদিন ত দেখনি। আমি সম্পর্কে তোমার খুড় শ্বশুর গো। আ কপাল, মানষের কুটুম এলে-গেলে!—যাওয়া-আসা ত' আর নেই, তাই অচেনা—তা হবে বৈ কি!—আসছিলুম মাঠ পেরিয়ে, গাঁয়ে ঢুকে দেখি কিছুই চিনিনে। তারপর বাউরী পাড়ার একটি মেয়ে এই চালাটা দেখিয়ে বলে গেল, তুমিই অধর চাটুর্য্যের বউ সূর্যমুখী! কেমন চিনে-চিনে এসে পড়েছি বলো দিকি, বৌমা?

দম নেবার জন্যে লোকটি বোধ হয় থামে।

ওদিকে পাঁচটি ছেলে মেয়ে তখন ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মতো হামলাচ্ছিল। বুড়ো সেদিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠে, এই—এই—হাত দিসনে, ওকে খেতে দে। দেখো, দেখো, যেন কুকুর বাচ্চার দল!—আর বলোনা বৌমা, দামোদরের বানে গেল গ্রাম ভেসে। বউটা ম'রে

গেল ওলাওঠায়—ছেলেমেয়ে কটাকে নিয়ে কোথায় আর যাই—ভাবলুম, হাজার হোক, বাপ পিতে মোর ভিটে—তুমিও আছ এখানে—তাই—এটি কে, তোমারই ছেলে বুঝি বৌমা? বেশ, বেশ—তোমার শ্বশুর ছিল আমার জ্যাঠতুতো খুড়োর সতাতো ভাই—তাহলেই হোলো,—কর্ত্তা-মার সেজছেলের পিসতুতো ভায়রা—সবই, মানে—ওই সবই—নিজেদের জ্ঞাতি গোষ্ঠির মধ্যেই, বুঝলে বৌমা? তা যাই হোক, আজ থেকে আমরা এখানেই থেকে গেলুম, বৌমা—হেঁ হেঁ—সবই আপনা আপনি ত!

সূর্যমুখী যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সহসা নিরুপায়ের মত সে তাকালো।

মাণিক এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, বা রে, থাকবো বললেই হলো? এখানে কোথায় থাকার জায়গা? আলাদা ঘর কই, শুনি?

বুড়ো বক্রচক্ষে বলে, হুঁ, ছেলেটি তোমার ভারি মুখোড় দেখছি! তা হবেনা কেন বলো বৌমা—চাটুয্যে বাড়ীর ছেলে, জাত সাপের বাচ্চা, বিষ ত থাকবেই!—

ওদিকে ছেলে মেয়েগুলো তখন প্রবল কলরবে এদিক ওদিক হাট বাধিয়েছে।

বুড়ো আবার বলে, তা শোনো বৌমা, এই ঘরটাতেই যা হোক ক'রে আমাদের চলবে, চালায় চারটি খড় ছেয়ে নেবো'খন। আর-ওই ত' তোমার উনুনটা—যা হোক ক'রে মিলে-মিশে থাকতে হবে বৈকি। কই, চিঁড়ে মুড়কি চারটি আছে নাকি—দাও দেখি বৌমা, শকুনিরা ছিঁড়ে খেলে!

সূর্যমুখী মৃদুস্বরে বলে, ঘরে কিছু নেই।

বুড়ো বলে, নেই? তবে এক কাজ করো। হাঁড়িটা চড়িয়ে চারটি চা'ল নাও দেখি? পাঁচটা ছেলে মেয়ে—পাঁচ পো চা'ল

নিলেই হবে। আর আমার জন্যে পোয়া তিনেক—মানে, সের তুই চা'ল—

মাণিক চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, চা'ল আসবে কোত্থেকে শুনি ?

বুড়ো বলে, বাপরে, তোমার ছেলেটার কী রোখ ছাখো বৌমা! দাঁতের বিষ নেই, কিন্তু ল্যাজের ঝাপটায় ধুলো ওড়ে।

মাণিক বলে, আমাদের এইটুকু ঘরে থাকবে কোথায় তোমরা ? খাওয়াবেই বা কে ? চাল অমনি হাঁড়িতে দিলেই হোলো!

বুড়ো বলে, হুম্। জ্ঞাতগুষ্টির ছেলে কিনা—হবেই ত! বুঝলে বৌমা, নেয্য অধিকার নিতে এলেই বন্ধু বিগড়োয়—এ জানা কথা! কিন্তু একটি কথা ব'লে রাখি, ছেলেকে তুমি লেলিয়ে দিয়ে আমার কিছু করতে পারবে না, আমি সে বান্দা নই। তা'র চেয়ে ভালোয় ভালোয় আমাদের ঘর দোর ছেড়ে দাও, বৌমা।

মাণিক দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আমার মাকে এসব কথা ব'লে শাসিও না বলছি—ভালো হবে না—

বুড়ো বলে, কি করবি রে তুই আমার ছোঁড়া ?

এই ব'লে বুড়োটা একটু এগিয়ে আসে। সূর্যমুখী আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে।

মাণিক বলে, যা করবো তা আগে থেকে বলবো না!

বুড়ো বলে, এঃ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। একটি চড়ে এখনি বংশের বাতি নিবিয়ে দেবো। খবরদার—

মাণিক মরিয়ার মত ব'লে ওঠে, কী বললে ? কি বললে শুনি ? —এই বলে সে একখানা হাতা নিয়ে মারমুখী হ'য়ে দাঁড়ায়। সূর্যমুখী তখন ছুটে এসে ছেলেকে ধ'রে বলে, মাণিক, ছি—ছি বাবা—লক্ষীটি গুরুজনের সঙ্গে এমন করতে নেই—দে, ছাড়—হাতা ছেড়ে দে—

মানিক তখন রাগে কাঁপছে। সূর্যমুখী তখন ঘোমটা টেনে মিনতির সুরে বলে, ও ছেলে মানুষ, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনি ভাববেন না।

বুড়ো বলে, বেশ আমি ততক্ষণ বাইরে বসি,—যা হয় ব্যবস্থা একটা ক'রে দাও,—তোমার স্বামী শ্বশুরের ভিটে, তুমি এখানকার ঘাট-পথ সবই জানো বৌমা। বানের জলে ভাসতে ভাসতে কুটো ধরেছি, বুঝলে? এ-কুটো কি আর সহজে ছাড়বো? বলতে বলতে লোকটা একটু বাইরের দিকে এগিয়ে যায়।

সেদিন সমস্ত বিকাল সন্ধ্যা রাত ব'সে ব'সে সূর্যমুখী কত কি ভাবলো। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। স্বামী আর শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে তা'কে চ'লে যেতেই হবে। অবশেষে শেষ রাত্রের দিকে সূর্য্যমুখী উঠে বসলো। ভোর হতে আর দেরী নেই! এই বেলা বেরিয়ে না পড়লে চলবে না। মানিক পাশে অকাতরে ঘুমিয়েছিল। সূর্যমুখী তার গা নেড়ে ডাকলে, মানিক—মানিক—আর ঘুম নয়, বাবা—ওঠ—

মানিক উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, কেন মা?

সূর্যমুখী বলে, চল, খানিক রাত থাকতে থাকতে আমরা বেরিয়ে পড়ি, বাবা।

মাণিক বলে, কোথায় যাবো মা?

সূর্যমুখী বলে, চল্ আগে বোরোই,—তারপর বল্‌ব—। গায়ে জামাটা দে। মানিক প্রস্তুত হয়ে নিল। সূর্যমুখী সজলচক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, না নেবার কিছুই নেই—চল্ বাবা বেরিয়ে পড়ি। ভোরের ঝাপ্‌সা অন্ধকার থাকতেই মা ও ছেলে পথে বেরিয়ে পড়লো।

প্রথমটা তাড়াতাড়ি তারা হাঁটতে লাগলো। তখনও আলো ফোটেনি। আকাশের তারা তখনও ঝলমল করছে। উপরের আকাশে সেই ধ্রুব তারাটির দিকে তাকিয়ে সূর্যমুখী ক্রন্দন কম্পিত কণ্ঠে বললে,—তোকে মানুষ ক'রে তুলবো, তুই একদিন বড় হ'বি মানিক—তুই মায়ের সব দুঃখ ঘোচাবি—তোর মাথা যেন সকলের উঁচুতে ওঠে—

মাণিক বললে, মা ?

কেন রে ?

কোথা যাবে বললে না ত ?

চল্ না, সইয়ের কাছেই যাই—তা'র কাছে গেলে আর আমাদের কোনো ভাবনাই থাকবে না। আমার সেই সইয়ের গল্প কি তোর মনে নেই ?

মাণিক একটু থেমে এক সময়ে বলে, তুমি যে বাবাকে বলতে, তোমার সইয়ের কাছে কিছুতেই যাবে না ? তবে আবার যাচ্ছ কেন শুনি ?

সূর্যমুখী বলে, চল্ মানিক, দাঁড়াসনে—

ক্রমে ভোর হয়ে আসে। দিনের আলো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। পাখীরা গান গাইতে থাকে। কৃষকরা লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠের দিকে যায়। মা ও ছেলে অনেকদূর পথ হাঁটতে থাকে। এক সময় আপন মনে সূর্যমুখী বলে, যেতে ইচ্ছে ছিল না রে, কিন্তু যাচ্ছি তোরই জন্যে বাবা।

মাণিক বলে, আমার জন্যে ? কেন মা ?

তোকে মানুষ করে তোলবার আর আমার কোনো উপায়ই নেই, মাণিক !

মাণিক বলে, তাই ব'লে তুমি যাবে তোমার সইয়ের কাছে হাত পাততে ?

দূরে একটি মন্দিরের দিকে তাকিয়ে সূর্যমুখী বলে, হাত পাতবো কেন, বাবা! তুই তো জানিসনে মানিক....আমাদের দুজনে কত ভালবাসা....কতদিনের কত...তা'র কাছে গেলে আমি ছোট হবো না!

মানিক বলে, মা—?

সূর্যমুখী মুখ ফিরালো।

মাণিক বলে, গিয়ে কি বলবে, তোমার সইকে?

সূর্যমুখী বলে, বলতে হবে কেন রে? সে কি বুঝবেনা?—চল্ বাবা, সইয়ের ঠাকুর বাড়ী এসে পড়লো বলে—চল্—

সূর্যমুখী মানিককে কতকটা যেন টেনে নিয়ে সেদিকে চললেন।

বাসন্তীপুর গ্রামে সেদিন রামনবমীর উৎসব। এই উৎসবে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে নরনারী আসে। জমীদারের প্রথা হলো, প্রথম রামনবমীর পূজা দেবেন জমীদার গৃহিণী, আর সেই উপলক্ষ্যে সমবেত দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাগণকে তিনদিন আহার ও বাসস্থান দেওয়া হবে।

মন্দিরে সেদিন বাজনা বাদ্যরব চলছে, এমন সময়ে সূর্যমুখী ও মাণিক সেই মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ালো। প্রথমটা তারা হকচকিয়ে গেল, তারপর যখন শুনলো যে, দিন দুই তিন থাকলে রাণীমার সঙ্গে দেখা হতে পারে, তখন সূর্যমুখী স্থির করলো,

একটা কিছু সিদ্ধান্ত না হওয়া অবধি তাকে এখানে থেকে যেতেই হবে।

তিনদিন তাদের একপ্রকার এখানে কেটে গেল। কিন্তু চারদিনের দিন আর কাটে না। সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠে। সবাই তাদের প্রতি বিরূপ বলে মনে হয়। অন্নজল আর গ্রহণ করতে হাত ওঠে না। এমন সময় কি যেন একট কথা ঝিকে জিজ্ঞেস করতেই ঝি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ওই নাও—চারদিন ধ'রে তোমার ওই একই কথা, বাছা! কতবার বলছি রাণী-মা আজ আসবেন—আজ যে রামনবমী! ঠিক আসবেন।

সূর্যমুখী সবিনয়ে বলে, কিন্তু এত বেলা হোলো কিনা—

ঝি কটু কণ্ঠে বলে, সে খবরে তোমার কি কাজ? যাও দিকি, গতরটা একটু নাড়ো! ক'দিন ধরে তোমাদের সেবা করতেই আমার প্রাণ বেরুলো। এই ব'লে সে নিজের কাজে চ'লে যায়। সূর্যমুখী নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

ওদিকে একদল গ্রামের লোক খেতে বসেছে। তা'র কাছেই একখানা চৌকীর ওপর ম্যানেজার বসেছে খাতাপত্র নিয়ে। ম্যানেজারের হাতে খাতাপত্র, লোকের ভিড়,—ভোজের পাত পাতা—ক্ষুধার্ত্ত বালক-বালিকা অন্যান্য নরনারী—সবাই খাবার জন্য লোলুপ হ'য়ে পাত পেতে ব'সে গেছে। ম্যানেজার তার খাতায় নাম দেখে দেখে তার সঙ্গে লোকজনদের মিলিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় ভাতের গামলা হাতে নিয়ে রাঁধুনি বামুন এসে বলে, নাও, বসো, বসে যাও তোমরা—

ম্যানেজার একটি বুড়ো লোককে ঠেলে দিয়ে বলে, আচ্ছা, তুমি যাও—লোকটা পাত পেতে বসে যায়।

ম্যানেজার আর একটি লোককে ধাক্কা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, তুমিও তুমি যাও—তুমি—

চারিদিকের জটলার মধ্যে ম্যানেজার সহসা একটি মেয়ের দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁগা বাছা,—তুমিই না সৌদামিনী দাসী? তিনদিন ধরে পেট পুরে খেলে,—আবার তবে পাত পাড়তে যাচ্ছ কেন? একি পায়রা মটর ছড়ানো, যে ঠুকরে খেলেই হ'লো? যাও—যাও—মেয়েটি বাধা পেয়ে কুণ্ঠিত হ'য়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

ম্যানেজার হঠাৎ মানিকের দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে, ওরে—ওই—তুই যে আবার গিয়ে বসলি? বটে! পাঁকাল মাছের মতন পিছলে ঢুকে পড়েছ, না? রাখাল ভট্টচার্যির চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়! ওঠ—ওঠ—ওরে, দে ত ছোঁড়ার কান ধরে তুলে?

মাণিক যেন ফেটে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, কেন? তুলে দেবে কেন শুনি? তুমি খাওয়াচ্ছ? একি তোমার ভাত?

ম্যানেজার কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, দেখো—দেখো—আবার চোখ রাঙাচ্ছে! ধানি লঙ্কার ঝাল বেশী—কেমন? দাঁড়া—ওরে রামশরণ—

মাণিক বলে, খাবো, বেশ করবো খাবো—সবাই খাবে আমি খাবো না?

ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বটে—বটে? দাঁড়া, খাওয়াচ্ছি! বাপের হোটেল পেয়েছ, না? ওরে, ধর ত' ছোঁড়াকে? দে,—দে তুলে—কান ধ'রে তাড়া!—

মাণিক তখনো চেঁচাচ্ছে, এমন সময় দ্রুতপদে সূর্যমুখী কাছে এসে ডাকলেন, মাণিক, ছিঃ বাবা—ছুটি ভাতের জন্যে ঝগড়া করতে নেই। আয়, এদিকে আয়—

মাণিক উচ্চকণ্ঠে বলে, কেন যাবো? অত ভাত রয়েছে, আর আমি খাবো না?

সূর্য্যমুখী বলে, তিন দিনের বেশী এখানে খাওয়া নিয়ম নেই রে, বাবা?

মাণিক বলে, তিন দিন খেয়েছি তাতে হয়েছে কি, তারপরে আর ক্ষিদে পায় না ?

এমন সময় ওদিক থেকে লোকজন চীৎকার করে ওঠে, চুপ করো, চুপ করো তোমরা—পথ ছেড়ে দাও—রাণী মা আসছেন—

সূর্যমুখী বলে, মাণিক এদিকে আয়, শিগগির এদিকে আয়—

ম্যানেজার হন্ত দন্ত হয়ে রাণীমার পথের দিকে এগিয়ে যায়। সবাই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে দর্শন করে রাণীমার আবির্ভাব। জনতার ভিতর দিয়ে তাঁর পথ। সাম্‌নে সিঁড়ি। দুধারে লোকদের মাঝখানে সূর্যমুখী আর মানিক ছিল দাঁড়িয়ে। রাণীমা চোখ বুলিয়ে নিলেন সেদিকে, কিন্তু যেন দেখতে পেলেন না। সিঁড়ি দিয়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন—এমন সময় সহসা নিরুপায়ের মতন সূর্যমুখী ডাকলে, সই! সই!

রাণীমা ফিরলেন, কিন্তু সইকে চিনতে পারলেন না। মাণিক হকচকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর দিকে তাকালো। তারপর উঠল সিঁড়িতে। কিছুদূর উঠে গিয়ে পিছন থেকে হঠাৎ রাণীমার আঁচল টেনে চেঁচিয়ে বললে, পুরনো বন্ধু, ডাকলে চিনতে পারো না কেন, শুনি ?

রাণীমা সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কে, কে তুই ?

এমন সময় চারিদিক থেকে সবাই ছুটে এলো। তা'র মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, গোলমাল, মারামারি।

সকলে বলতে লাগলো, ছেলেটা কেরে ? কাদের ছেলে ? হতভাগা! পাগল! কী আস্পদ্দা দেখো ছেলেটার—

—ধর—ধর—গলা ধাক্কা দে—

মাণিককে সবাই ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল। সে গড়াতে গড়াতে ওলোট পালট খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। রাণীমা উপরে উঠে গেলেন। সবাই গেল তাঁর পিছু পিছু।

সূর্যমুখী স্তব্ধভাবে কাষ্ঠপুত্তলীর মতো দাঁড়িয়েছিল।

কেন, কেন ওরা মারলো আমাকে—আমি কোনো দোষ করিনি—মার দিকে চেয়ে মাণিক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সূর্যমুখী সহসা মাণিককে ধ'রে বেদম প্রহার করতে লাগল। বললে, যত অপমান, যত অশান্তি তোর জন্যে—যা, যা দূর হ—চলে যা সামনে থেকে—বলতে বলতে মাণিককে ঠেলে বা'র ক'রে দিল।

মাণিক কেঁদে বললে, আমি কোনো দোষ করিনি—আমি কোনো দোষ করিনি। চোখ মুছতে মুছতে মাণিক দেউড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমটা কাঁদতে কাঁদতে মাণিক বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাকে ছেড়ে সে যাবেই বা কোথায়? কিছুক্ষণ পরে কান্না শান্ত হ'লে সে আবার মন্দিরে ফিরে এলো। সূর্যমুখী ইতিমধ্যে তা'রই খোঁজে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মাণিক ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সেই ঝি-টির সঙ্গে দেখা। ঝঙ্কার দিয়ে ঝি বললে, পোড়ার মুখ নিয়ে আবার এলি কোন্ মতলবে?

মাণিক বললে, আমার মা কোথায়?

ঝি মুখ বেঁকিয়ে বক্রকণ্ঠে বললে, মা! মা কোথায়! দেখ্‌গে যা কোন্ চুলোয় গেছে তোর মা—এখানে এলে আর ঢুকতে দেবো না। যা দূর হ'—মাণিক তাড়াতাড়ি অন্য পথ দিয়ে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সামনের পথটা ধ'রে মাণিক কিয়ৎক্ষণ চললো। কিন্তু এদিকে তা'র মা যাবেই বা কেন? মাণিক অন্যপথ ধরলো। সেই পথে

কিছুদূর গিয়ে একটি স্ত্রীলোককে দেখে মাণিক প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, এদিকে তোমরা আমার মাকে যেতে দেখেছ ?

স্ত্রীলোকটি বললে, কাদের ছেলে গো! কে তোমার মা ? কই দেখিনি ত ?

মাণিক এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বললে, ও!—এই ব'লে সে আবার চলতে লাগলো।

সন্ধ্যা হয়ে এলো দেখতে দেখতে। মাণিক তখনও চলেছে। পথে একটি কৃষক তাকে দেখে বললে, তুমি কাদের ছেলে, বাবা ?

মাণিক বলে, আমার মায়ের ছেলে। মা কোন্‌দিকে গেল, দেখেছ ? লোকটা বললে, কই না! মাকে খুঁজে পাচ্ছনা বুঝি ?

মাণিক কম্পিত কণ্ঠে বললে, না—তো—

কৃষক বললে, হাটতলার দিকে যাও দেখি ? এই রাস্তা—

মাণিক ছুটতে ছুটতে হাটতলার দিকে চললো।

হাটতলায় এসে মাণিক ক্লান্তভাবে চারিদিকে তাকালো। লোকেরা তখন কাজ সেরে এদিকে ওদিকে চলেছে।

মাণিক একবার ঘুরে ফিরে চারিদিকে খোঁজ করলো। অবশেষে চীৎকার ক'রে ডাকলো, মা! মা!....মা গো! কিন্তু কোথাও মায়ের সন্ধান পেলো না!

ওদিকে মন্দির থেকে বেরিয়ে সারাদিন সূর্যমুখী মাণিককে খুঁজে বেড়াতে থাকে। সেই যে মার খেয়ে মাণিক বেরিয়ে পড়েছে, তারপর আর তা'র খোঁজ খবর নেই। সূর্যমুখী অবশেষে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে করতে অপরাহ্ণের দিকে এক সময় ষ্টেশনের ধারে এসে পৌছলো। তখন সবে মাত্র একখানা ট্রেণ এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে।

সূর্যমুখী দূরের থেকে দেখলো একটি ছেলে উঠছে গাড়ীতে। সে চীৎকার ক'রে উঠলো, মাণিক—মাণিক—শোন—যাসনে বাবা—এই যে আমি—

. গাড়ী তখন বাঁশী বাজিয়ে ছাড়ছে। এমন সময় বেপরোয়ার মতো সূর্যমুখী সেই সায়াহ্নকালের আসন্ন অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে ষ্টেশনের প্লাটফরমে ঢুকে সোজা ঝাঁপিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলো।

কিন্তু—কিন্তু একি, এত' মাণিক নয়!

গাড়ী তখন চলছে।

সূর্যমুখী রুদ্ধশ্বাসে অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ও বুঝতে পারিনি, বাবা! আমি নামবো—আমি নেমে যাবো। একটি বুড়ো লোক এপাশের বেঞ্চে বসেছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আহা করো কি বাছা—করো কি? গাড়ী চলছে যে—

সূর্যমুখী ব্যস্তভাবে বললে, কিন্তু মাণিক যে প'ড়ে রইলো—আমি নামবো—আমি নামবো—

বুড়ো বললে, নামতে পারবে কেন মা, এ যে চলন্ত গাড়ী—

সূর্যমুখী বললে, এ গাড়ী আবার থামবে কখন বলতে পারেন? গাড়ী তখন দ্রুতগতিতে চলেছে। দুইধারের মাঠ দুইদিকে সরে যাচ্ছিল।

বুড়ো বললে, শান্ত হও মা, একটু বাদেই গাড়ী থামবে। তখন নেমে যেয়ো!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটি ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামতেই সূর্যমুখী আর সেই বুড়ো লোকটি নামলো। বুড়োর সঙ্গে ইতিমধ্যে সূর্যমুখীর অনেকটা আলাপ হয়েছে। বুড়ো নেমে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গেল, কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরেও এলো। এসে বললে, ইষ্টিশন মাষ্টার বললেন, সকালের আগে তোমার ফেরবার আর গাড়ী নেই, মা!

সূর্যমুখী ব্যাকুল হয়ে বললে, তা হলে কি হবে বাবা? আমাদের যাবার আগে মাণিক যদি অনেক দূরে চ'লে যায়?

বুড়ো বললে, ভয় কি মা,—তুমি যখন আমাকে বাবা ব'লে ডেকেছ, তোমার ছেলে যত দূরেই যাক্—তোমার কোলে তাকে ফিরে এনে দেবোই। দরকার হয় দেশসুদ্ধু তোলপাড় করবো, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো—গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজে বেড়াবো।

সূর্যমুখী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে, বাবা, মাণিক যে আজ খেতে পায়নি, তা'র যে থাকারও জায়গা নেই—রাত তা'র কেমন ক'রে কাটবে?—তা'র কণ্ঠস্বর কান্নার আবেগে যেন থর থর ক'রে কাঁপছিল। আর কিছু সে বলতে পারলো না।

বুড়ো সান্ত্বনার সুরে বললে, কি করবে মা, সব দুঃখীর বন্ধু যিনি, তিনিই তোমার ছেলেকে দেখবেন। হুঃ—মেয়েটাকে হারিয়ে—ভাবলুম নিশ্চিন্তে গিয়ে কাশীবাস করবো—কিন্তু তুই বাবা ব'লে ডেকে আবার আমার জ্বালা বাড়ালি মা!

সূর্যমুখী মুখ ফিরিয়ে সহসা প্রশ্ন করলো, আপনার মেয়েও কি হারিয়েছে, বাবা?

বুড়ো ভগ্নকণ্ঠে বললে, হারিয়েছে মা, হারিয়েছে! একেবারেই হারিয়েছে! তুই তোর হারানো মাণিককে আবার ফিরে পাবি মা,—কিন্তু আমার হারানো উমা আর কোনো দিন ফিরবে না।

সূর্যমুখী তা'র অশ্রুসজল দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে অন্ধকারের গভীরের দিকে তাকালো। অন্ধকার অরণ্য পথ, প্রান্তর—সমস্ত পেরিয়ে তা'র বড় বড় চোখ দুটো ছুটলো হারানো মাণিকের পিছনে পিছনে।

আর ঠিক সেই সময় বহুদূরে কোনো এক গ্রামের একান্তে হাটতলায় খুঁটির পাশে মাণিক কাতরভাবে নিদ্রিত, এমন সময় স্বপ্নলোকে তা'র জননীর নিত্য জাগ্রত করুণ দুটি চক্ষু এসে তা'র মুখের উপর যেন স্থির হলো। মাণিক যেন তা'র মায়ের কোমল স্নেহের স্পর্শ অনুভব করছে ঘুমের ঘোরে।

সূর্যমুখী যেন তার কপালে হাত রেখে বলছে, মাণিক, তুই বড় হবি, মানুষ হবি, তোর মায়ের দুঃখ ঘোচাবি—তোর মাথা একদিন সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠবে!

মাণিক সহসা জেগে উঠে নিদ্রালুচক্ষে ডাকলো, মা—মা!

চারিদিকে সে তাকালো। কিন্তু কোথায় তা'র মা?...তখন ক্লান্তভাবে মাণিক উঠে দাঁড়ালো। সামনের পথটা ধরে এলোমেলো-ভাবে সে চলতে লাগলো।

ভোর বেলা জনৈক ব্রহ্মণ সেই পথে আসছিলেন। মাণিক থমকে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, দেখুন, একটা কথা, আমার মাকে দেখেছেন এপথে?

ভট্চার্যিমশাই অবাক হয়ে তা'র দিকে তাকালেন। বললেন, কে তোমার মা?

মাণিক বললে, আমার মা, মাকে খুঁজছি কিনা—

ভট্চার্যিমশাই বললেন, ও, দেখলুম বটে একজন মেয়েছেলেকে—ওই যে সেরেস্তার দিকে গেল—সুন্দর মতোন,—দেখো দেখি বাবা!

কথাটা শুনেই মাণিক সেইপথে দৌড়লো। ভট্চার্যিমশাই তা'র পথের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

মাণিক ছুটতে ছুটতে এসে কাছারী বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। একটা অপরিচিত ছেলেকে এইভাবে ঢুকতে দেখে বা'র বাড়ীর একটি লোক

ব'লে উঠলো, আরে—আরে—আরে—এই ছোঁড়া, ভেতরে যাস কোথায় ?

মাণিক বলে, আমার মা আছে ভেতরে—আমাকে যেতে দাও। মাণিক ভিতরে ছুটলো পাগলের মতো।

লোকটা চেঁচিয়ে বললে, দেখো, কাণ্ডটা দেখো—আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢোকে। খবরদার বলছি—এই—ওরে—ওদিকে কে আছিস ?

লোকটা ছুটলো মাণিকের পিছু পিছু।

অন্দরমহলে বৌরাণী তখন নায়েবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁদের সামনে একটি মহিলা রয়েছে দাঁড়িয়ে। নায়েব তাঁকে দেখিয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এর কথাই আপনাকে বলছিলুম কালকে। তিন তিন কিস্তির খাজনা বাকী। নালিশ করলে পথে দাঁড়াবে—এখন এর উপায় আপনার হাতে—

স্ত্রীলোকটি বললে, তোমরা না দেখলে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে, বৌমা।

রাণীমা বললেন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?

স্ত্রীলোকটি বললে, যদি এবারের খাজনাটা মাপ ক'রে দাও, তবে আমি যাহোক ক'রে ঘটি বাটি বেচে কাশী চ'লে যেতে পারি।

রাণীমা বললেন, সেখানে আপনার কেমন ক'রে চলবে ?

স্ত্রীলোকটি বললে, কিছুই জানিনে মা, তবে বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় যদি সেখানে ভিক্ষে সিক্কেও মেলে !

রাণীমা বললেন, আচ্ছা, আপনাকে আর কোনো বিপদে পড়তে হবে না। আমি আপনার যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

স্ত্রীলোকটি বললে, তবে এখন আসি মা। তোমার কথাই আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। এই ব'লে মহিলাটি বিদায় নিলেন।

নায়েবমশাই বিদায় নিয়ে চ'লে যাবেন এমন সময় বাইরে থেকে

কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার মা, আমার মা আছে ভেতরে—আমাকে যেতে দাও—যেতে দাও—

বৌরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কে? কে ডাকছে নায়েব মশাই?

নায়েবমশাই ফিরে তাকাতেই মাণিক তা'র জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদে দ্রুতপদে ভিতরে এসে ঢুকলো। বৌরাণী কেমন যেন চকিত হয়ে উঠলেন।

মাণিক সহসা থমকে হতাশভাবে বললে, ও,—মা কোথায়?—

নায়েবমশাই ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললেন, কে রে? কাদের ছেলে তুই? যা—যা এখান থেকে? বলা নেই—কওয়া নেই—পালা, পালা—যা—

মাণিক সজল চক্ষে এবার ব'লে উঠলো, দেখুন....আমি এলুম... দুদিন ধ'রে মাকে—খুঁজছি—পাচ্ছিনে—

নায়েব সবিস্ময়ে বৌরাণীর দিকে তাকালেন! বললেন, তাইত রাণীমা, বেশ ছেলেটা দেখছি। কিন্তু তোর মা এখানে কোথায় রে? এটা জমিদার বাড়ী,—এখানে তোর মা কোথায়?

মাণিক তখন নিরুপায় হয়ে চ'লে যাবার জন্য পিছন ফিরলো।

বৌরাণী ডাকলেন, শোন খোকা—

মাণিক ফিরে দাঁড়ালো। বৌরাণী বললেন, তুমি যেয়ো না, আমি তোমার মাকে খুঁজে দেবো।

মাণিক সকরুণ কণ্ঠে বললে, কি বলছেন আপনি?

বৌরাণী নায়েবমশাইকে বললেন, আপনি তাহলে ওই মহিলাটির যা হয় ব্যবস্থা করে দেবেন, দেখবেন, ওর নামে যেন নালিশ না হয়—

যে আজ্ঞে।—ব'লে নায়েবমশাই একবার মাণিকের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বৌরাণী এবার এগিয়ে এলেন মাণিকের দিকে। বললেন, মাকে কেমন ক'রে হারালে, বাবা?

মাণিক বললে, মা আমাকে মারলো, আমি রাগ করে চলে গেলাম, তরপর·······আর দেখিনি। গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজে কোথাও পাইনি! আপনি দেবেন খুঁজে?—আমার মাকে?

বৌরাণী স্নেহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেবো, তুমি থাকো এখানে? পাবে বৈ কি—ঠিক এসে পড়বে একদিন তোমার মা—আমি কথা দিলুম।—আহা, বাছারে—

এমন সময় জমিদার যুগলবাবু ওধারের বারান্দা পেরিয়ে এধারে এলেন। নতুন একটি বালককে দেখে বললেন, এ আবার কে গো? কোন্ ডোবা থেকে আবার আগাছা তুলে আনলে?

বৌরাণী বললেন, আহা, ওকথা বলোনা! ওর মা হারিয়েছে, তাই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছে।

যুগলবাবু বললেন, তা বেশ ভালোই, তোমারই সুবিধে হোলো। নাও, এবার খাওয়াও, পরাও, বাঁশী কিনে দাও, নতুন জুতো দাও, ইস্কুলে পাঠাও! তা বেশ, ভালো। কিন্তু মনে রেখো বড়বউ, জঙ্গলের পাখী কোনকালেই পোষ মানে না। যতই করো না কেন তা'র চোখ দুটো থাকে বনের দিকে।

বৌরাণী স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর মাণিকের দিকে চেয়ে বললেন, যদি চ'লে যাবার পথ খুঁজে পায় একদিন না হয় যাবে! কিন্তু আজ সে কথা থাক—

এস বাবা—মাণিককে নিয়ে তিনি ভিতর মহলের দিকে পা বাড়ালেন।

যুগলবাবু নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগলেন, হুঃ যত সব বেনোজলের দৌরাত্ম্যি এ-বাড়ীতে! কাছারিটেকেও ক'রে তুলেছে সব হরিঘোষের

গোয়াল। নাঃ দেখছি কাশীই পালাবো, নৈলে এরা আর জব্দ হবে না!—বলি নায়েব, ওহে শুনছ?—

নায়েবমশাই কোথায় ওধারে যেন ছিলেন, তাড়াতাড়ি ভিতরে এলেন।

যুগলবাবু বললেন, বলি, ভেবেছ কি তোমরা?

নায়েবমশাই বললেন, আজ্ঞে, কই কিছু ত ভাবিনি।

যুগলবাবু বললেন, ভেবেছ বৈ কি—ভেবেছ, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমি কাশী পালাবো, আর তোমরা এই জমিদারীটে লুটে পুটে খাবে কেমন?

নায়েবমশাই অবাক হয়ে বললেন, আজ্ঞে না, ওসব কথা কি আমরা ভাবতে পারি, কর্তামশাই?

যুগলবাবু বললেন, আলবৎ ভেবেছ! ওই কথাটা ভেবে ভেবেই শরীর কাহিল করেছ। নৈলে এই ছাখো দেখি, এই যে হাঁসপাতালে এত টাকা দান করলে—এ কা'র হুকুমে?—এই ব'লে তিনি ফাইলটা খুলে ধরলেন।

নায়েবমশাই বললেন, আজ্ঞে, আপনিই ত ও টাকার বরাদ্দ করেছেন!

যুগলবাবু বললেন, বটে, আমি করেছি ব'লেই তুমি অমনি দিয়ে দিলে! বিচার নেই, বিবেচনা নেই—টাকাটা কি গাছের ফল? পেড়ে দিলেই হোলো?—আর এটা কি, এই যে লাল কালির দাগ টানা খরচটা—এ তুমি কোত্থেকে পেলে?

নায়েবমশাই বললেন, আজ্ঞে, ও দাগটানা টাকাটা আপনিই ত' নিয়েছিলেন?

যুগলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, মিছে কথা! তুমি মিথ্যেবাদী। অনেয্য খরচ আমি একটুও করিনে। এসব যা কিছু অনেয্য—অনেয্য নিয়েই তোমাদের কারবার।

নায়েবমশাই সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞে, আপনার স্মরণ নেই; কর্তামশাই!

যুগলবাবু ফেটে পড়লেন, বললেন, বটে আমার স্মরণ নেই! তোমার রাণীমার মতন বুঝি আমাকেও ভূতে পেয়েছে? ওসব হবে না নায়েব, বুঝলে? ওসব চলবে না—অত খরচ চলবে না—ওসব অসঙ্গত, অনাবশ্যক।—এই দেখনা, কোথাকার কোন্ ইত্যিজাতের ছেলে···উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে এসে চড়লো!—ওসব হবে না, বারো ভূতকে খাইয়ে আমার জমিদারী ফতুর করা চলবে না!—ছোঁড়াটাকে তাড়াও। আজই তাড়াও।

এমন সময় মাণিক সহসা ঝড়ের মতো এসে দাঁড়ালো। বললে, আমাকে গাল দিলেন, আমি কি করেছি?

যুগলবাবু বললেন, করেছ মাথা আর মুণ্ডু! ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে উঠ্‌ছো। এখন তোমাকে তাড়াই কি ক'রে তাই বলো দিকি, বাপু?

মাণিক বললে, আমি নিজেই চ'লে যাবো। আম থাকবো না, কারো গালাগালি শুনবো না। এই ব'লে সে যাবার উদ্যোগ করতেই বৌরাণী পিছন থেকে এসে তা'র হাত ধরলেন। স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, হ্যাঁগা, কি হলো, কি বলেছ?

হ্যাঁ রে, কোথা যাস মাণিক?

মাণিক উত্তেজিতভাবে বললে, আমি থাকবো না, আমি চললুম—সে আবার যাবার চেষ্টা করলো।

বৌরাণী বুঝিয়ে বললেন, শোন্ বাবা, শোন্—লক্ষ্মীটি—আমি যে বলেছি তোর মাকে এনে দেবো—কোথা যাস—শোন—ওরে—

মাণিক তাঁর হাত ছাড়িয়ে চললো। বললে, না, না, না—আমি থাকবো না—আমার মা এখানে আসবে না—ছুটতে ছুটতে সে

বাইরের দিকে গেল, আর বৌরাণী চললেন তা'র পিছু পিছু। বললেন, শোন্, হ্যাঁ রে—

মাণিক বললে, না, না, থাকবো না—আমাকে চ'লে যেতে দিন—

বৌরাণী বললেন, যাস নে, শুনে যা,—মাণিক—

মাণিক বললে, না, আমি শুনবো না,—না—না—

কিন্তু বাইরে যাবার পথে গিয়ে মাণিক দেখে দেউড়ী বন্ধ। তখন সে সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। যেন এই দেউড়ী তা'র মুখের ওপর চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন সময় বৌরাণী ছেলের কাছে এগিয়ে এলেন, মাণিকের চোখে তখন ছলছলিয়ে জল এসেছে। বৌরাণী অতি স্নেহের সঙ্গে সেই জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, তোর মাকে আমি এনে দেবো। যতদিন না পারি, ততদিন আমাকেই তোর মা হ'তে দে, বাবা—আমার কথা শোন—

মাণিক শান্তভাবে চুপ্ ক'রে রইলো।

যেন নূতন এক জননীর স্নেহ সে লাভ করেছে।

সেইদিন রাত্রে—ছেলেটা শুয়ে রয়েছে নিশ্চিন্তে একটি খাটে। এপাশের খাটে বৌরাণীর চোখে নিদ্রাভাব। এমন সময় দরজার পাশে যুগলবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বড় বউ?

বৌরাণী উঠে বসলেন। বললেন, কি গো?

যুগলবাবু বললেন, একটা কথা বলছিলুম—কি যেন ভাবছিলুম—ওই তোমার ছেলেটার কথাই বলতে এলুম—

বৌরাণী বললেন, কি বলছ?

যুগলবাবু বললেন, কথাটা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পাচ্ছিনে। মনের চেহারাটা বোঝানো যায় না, জানো ত? কিন্তু আর যাই করো, বড় বউ ছেলেটাকে তুমি যেন আর ছেড়ে দিয়ো না।

বৌরাণীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

৩

বৃদ্ধের সঙ্গে সূর্যমুখী অবশেষে কাশীতে এসে হাজির হয়েছে। ইতিমধ্যে বুড়ো কৈলাসবাবু বাংলার বহু স্থানে নিজে ও লোকমারফৎ মাণিককে খুঁজেছেন—কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তখন তিনি স্থির করলেন, কাশী গিয়ে সুস্থির হয়ে ব'সে তিনি এই সমস্যার একটা কিনারা করবেন। তাছাড়া সূর্যমুখীর কোনো আশ্রয় নেই,—সে মেয়েছেলে,—তা'রও যা হোক একটা ব্যবস্থা করা চাই।

এই সব নানাবিধ চিন্তা ক'রে কৈলাসবাবু সূর্যমুখীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে এসেছেন। একটি বাসাবাড়ীতে তারা থাকেন, আর নানাস্থানে চিঠিপত্র লিখে পাঠান। দেখতে দেখতে 'হারানো প্রাপ্তি আর নিরুদ্দেশের' ফাইলে তা'র শোবার ঘরটি ভরে উঠলো। চারিদিকে রাশি রাশি কাগজপত্র, আর সংবাদপত্রের বিভিন্ন কাটিং। এরই মাঝখানে কৈলাসবাবু ব'সে কাজ করেন।

সেইদিন সেইখানে বসে তিনি হাঁকাহাঁকি ক'রে উঠলেন, এই নাও, সেরেছে, কই, কোথা ফেললুম! এই যে এইখানেই ছিল,—গেল কোথা?—বলি কই গো মা, কলকাতাটা—কলকাতাটা কোথা—হারালুম বলো দিকি?

সূর্যমুখী রান্না চড়িয়েছিল। কৈলাসবাবুর ডাকে তাড়াতাড়ি এঘরে এলো। বললে, আমায় ডাকছেন বাবা?

কৈলাসবাবু বললেন, ডাকছি কি সাধে? বাঁশ বনে ডোম কানা!

এই ছাখো এই মেদিনীপুর--এই বাঁকুড়া—আর এই হলো তোমার বর্ধমান—কলকাতাটা হারালুম কোথায় ? দেখো দেখি মা—কোথায় চাপা পড়লো ?

সূর্যমুখী এদিক ওদিক খুঁজে বলল, আপনার হাতে ওটা কি ?

কৈলাসবাবু বললেন, হাতে! তাইত—দেখলি ত মা? সব ভুল ঘট্‌ছে—ঘট্‌বেইত—বুড়ো বয়সে এলুম নিশ্চিন্তে কাশীবাস করতে,. ভাবলুম মেয়েটা মলো—সব চুকে বুকে গেল। কিন্তু এ আবার কি উৎপাত বল দেখি ?—তুমি তোমার ছেলে হারানো চাপালে আমার ঘাড়ে—এখন করি কি ?

সূর্যমুখী করুণ চক্ষু তুলে উপর দিকে তাকাল। তার বলবার কথা মুখের মধ্যে থিতিয়ে রইলো।

কৈলাসবাবু নতুন ফাইলটা তুলে নিলেন। বললেন, এই ছাখো —আমি দিলুম কাগজে বিজ্ঞাপন তোমার ছেলেটার জন্য—তার বদলে যত হারানো আর নিরুদ্দেশের ছবি জড় হ'ল আমার ঘরে— কার মা হারালো ; কার মেয়ে কোনদিকে ইচ্ছে করে হারালো,— তা আমার কি ? আমি কি করব—আমি নিশ্চিন্তে এলুম কাশীবাস করতে,—আর আমি খুঁজে বেড়াব যত রাজ্যের মেয়ে আর ছেলে ? হারাক, হারাক, সবাই হারাক—মেয়ে হারাক—ছেলে হারাক— পারিস্ যদি তুইও হারা মা !

সূর্য্যমুখী বললে, বাবা !—

কৈলাসবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বাবা, আর বাবা ! মেয়েটা মোলো ভাবলুম—আর বুঝি কেউ ডাকবে না বাবা বলে ! বাবা বলেই তুমি আবার আমার সর্বনাশ করলে। নাও,— নাও—নাও—কি বল্‌ছ ?

সূর্য্যমুখী বললে, আপনি অনেক চেষ্টা করলেন, শুধু আমারই জন্য !—কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না—এ আমারই ভাগ্য !

কৈলাসবাবু বললেন, কে বলে পাওয়া গেল না? পেতেই হবে—খুঁজে আমি তাকে বার করবই! খুঁজতে খুঁজতে বাবা বিশ্বনাথকে—একদিন পাব, আর তোমার ছেলেকে খুঁজে পাব না?

সূর্যমুখীর করুণ চক্ষু দুটি জলে ভরে এলো।

কৈলাসবাবু যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন, এই আমি চললুম। তোর ছেলে আমি খুঁজে দেবোই। আমি এলুম নিশ্চিন্তে কাশীবাস করতে....আর যত সব—। মেয়েটা ম'লো, ভাবলুম—যাক্ বেঁচে গেলুম! কিন্তু এখন দেখছি মা আর মেয়েতে দেশ ভরা—পালাবার যো নেই।

বলতে বলতে তিনি চটি পায় দিয়ে কাঁধে উড়ুনী নিয়ে বেড়িয়ে গেলেন।

সূর্যমুখী জলভরা নেত্রে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

জমিদার বাড়ীর পথে সেদিন এক জটলা দাঁড়িয়ে গেছে। নানাজনে নানাকথা বলাবলি করে। এমন সময় ওধার থেকে শশধর এগিয়ে এসে বললে,—বলি ওহে খুড়ো, একি শুনছি?—তোমার নাকি অন্ন উঠলো?

খুড়ো রাগে গরগর ক'রে উঠলো, কেন? কেন শুনি?

শশধর ব্যাঙ্গ হাসি হেসে বললে, জমিদার বাড়ীর পুষ্যিপুত্তুর ছিলে......সময়ে অসময়ে কলাটা মূলোটা পেতে—। এবার যে তোমার বরাত উঠলো?

খুড়ো চোখ পাকিয়ে বললে, কি—ই—ই? মুখের চেয়ে তোর কথা বড়? সাবধান বলছি।

জলধর নিশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের ভাই জন্ম থেকেই কপাল মন্দ! নৈলে,—ছোঁড়াটা তা'হলে কায়েম হয়েই বসলো, কেমন?

হলধর হতাশভাবে বললে, তা বসলো বৈ কি—বাবা স্থিনাথের মতন একেবারে চেপে বসলো! তখনই বলেছিলুম—

খুড়ো হলধরকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বললে, থাম্ থাম্—বলেছিলুম আর বলেছিলুম!

হলধর চোখ পাকিয়ে বললে, এই খবরদার বলছি খুড়ো—গায় হাত দিয়ো না—ও আমি সইতে পারিনে।—আমি তখনই বলেছিলুম, বেনোজল ঢুকে বেড়াজলে আটকে যাবে? এখন নাও, খুড়োর দুঃখে কাঁদো সবাই?

খুড়ো রাগে অপমানে চেঁচিয়ে উঠলো, কি—ই—ই?

এই ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি যখন বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে, সেই সময় শশধর ব'লে উঠলো, আরে—চুপ—চুপ—নায়েবমশাই?

নায়েবমশাই কাছারি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, শশধরকে দেখে বললেন, এই যে শশধর—তাহ'লে তোমরা কতদূর কি করলে?

শশধর হাত কচলিয়ে বললে, আজ্ঞে, আশেপাশে প্রায় তিরিশখানা গাঁয়ে খোঁজাখুঁজি করলুম। মাণিকের মা ব'লে কাউকে পাওয়া গেল না।

নায়েবমশাই কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, হুঁ—আচ্ছা—কিন্তু খোঁজাখুঁজি ছেড়ো না তোমরা, ব'লে রাখলুম।

শশধর বললে, যে আজ্ঞে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হলেও আমরা খোঁজাখুঁজি ছাড়বো না।

নায়েবমশাই যেমন এসেছিলেন, তেমনি আবার চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গদাধর তার ফাইলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আজ্ঞে চৌধুরীদের দরুণ এই চালানটা—

নায়েবমশাই ব্যস্তভাবে বললেন, আচ্ছা থাক্—ওসব কাল হবে—এখন আমার মরবারও সময় নেই—

বলতে বলতে তিনি অন্যমনস্কভাবে অন্যত্র চ'লে গেলেন।

বাইরে একটি ফুলবাগান ছিল। নায়েব মশাই বেরোতেই দেখেন তারই একান্তে একটি পেটির ওপর বসে রয়েছে মাণিক। তা'র সামনে ওই আমের চারাগাছটি তা'র যেন নিঃসঙ্গ জীবনের একটি সঙ্গী—রাজসংসারের এত বড় সমারোহের মাঝখানে তা'র শিশু মন উন্মুখ হয়ে ছুটেছে নিরুদ্দেশ জননীর সন্ধানে—

নায়েবমশাই তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পিছন থেকে ডাকলেন, ছোটবাবু!

মাণিক ফিরে তাকালো।

নায়েবমশাই সস্নেহে বললেন, একলা বসে যে?

মাণিক উদ্গত অশ্রু দমন করে বললে, ভেতরে আমার ভালো লাগে না!

নায়েবমশাই বললেন, মায়ের জন্যে মন কেমন করছে, না? ভয় কি? এই ত' কর্তামশাই ক'দিন থেকে কত্‌দিকে কত লোকজন পাঠিয়েছেন—খবর একটা পাওয়া যাবে বৈকি!

মাণিক বললে, খবর কবে আসবে, শুনি?

নায়েবমশাই বললেন, খবর! খবর এলেই পাওয়া যাবে!—এই ছাখো না ছোটবাবু, তোমাকে পেয়ে রাণীমার মুখে কতকাল পরে হাসি ফুটলো!—এই ব'লে তিনি নিশ্বাস ফেললেন। সে আজ বছর দশেকের কথা—বুঝলে ছোটবাবু, সাত দেবতার দোর ধ'রে একটি বংশধর যদি বা হোলো, ছেলেটি বাঁচলো না—

মাণিক তাঁর দিকে মুখ ফিরে তাকালো।

নায়েবমশাই বললেন, ছেলেটি সবে হাঁটতে শিখছিল—রাণীমা আদর করে নাম দিয়েছিলেন বিশু—কিন্তু ভাগ্য বিরূপ—সইলো না। তিন দিনের জ্বরে ছেলেটা চ'লে গেল! সেই থেকেই কর্তামশাই আধপাগলের মতন হয়ে গেলেন,—কাকে কখন কি বলেন, তাঁর হুঁস থাকে না!

এমন সময় ওধার থেকে রাণীমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মাণিক?

নায়েবমশাই বললেন, ওই যে, মা আসছেন?

বৌরাণী বাইরের বাগানের প্রান্তে এসে দেখেন, মাণিক ব'সে। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, খুঁজে পেলেন যেন তাঁর রত্নটিকে! চোখে মুখে সহাস্য মাতৃস্নেহ, মধুর বাৎসল্যের আবেশ—কল্যাণরূপিণী তিনি। কাছে এসে মাণিকের মাথায় হাত রেখে করুণ স্নেহে ডাকলেন, মাণিক—!

কেমন একপ্রকার সলজ্জ কুণ্ঠায় মাণিক তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

রাণীমা বললেন, তুই আড়ালে থাকলে আমিও যে একলা প'ড়ে যাই বাবা—

মাণিক নতমুখে চুপ করে ব'সে রইলো।

রাণীমা বললেন, নায়েবমশাই, রতনডাঙ্গার ওদিকে লোক পাঠিয়েছেন কি?

নায়েবমশাই বললেন, হ্যাঁ মা,—চারদিকেই লোক পাঠিয়ে খোঁজা খুঁজি করছি! কিন্তু—সময় না হ'লে কোনো কাজই হয় না মা। যাই, আমাকে আবার এখুনি,—তবু ব'লে যাই মা, আমি সাধ্যমতো আজো চেষ্টা করছি। দরকার হলে এমন কাজও করব যা সাধ্যের বাইরে।

বলতে বলতে নায়েবমশাই সেখান থেকে চ'লে গেলেন ব্যস্তভাবে।

রাণীমা ধীরে ধীরে মাণিককে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, মাণিক! বাবা—

মাণিক মুখ তুললো।

রাণীমার কোমল আয়ত দুটি চক্ষু অতীত কালের সন্তান বিয়োগ বেদনার স্মৃতিতে অশ্রুসজল হয়ে এসেছিল। মাণিক কিছুই বুঝতে পারলো না, কিন্তু অভিভূতভাবে যেন নিজেকে ছেড়ে দিল।

রাণীমা বললেন, আমার জীবনটা যেন অন্ধকারে খাঁ খাঁ করছিল, তুই এসে আলো জ্বেলেছিস, মাণিক।

মাণিকের একখানি হাত ধীরে ধীরে রাণীমার গলার কাছে উঠে একটি সান্ত্বনার আশ্রয়ের মতো তাঁকে আঁকড়ে ধরলো।

এমন সময় দেখা গেল অদূরে নিঃশব্দে যুগলবাবু দাঁড়িয়ে বাৎসল্যের এই স্বর্গীয় মহিমা নিরীক্ষণ করছেন—অভিভূতের মতো।

যুগলবাবু প্রসন্ন স্মিতমুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, বড় বউ!—

বড়বউ হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকালেন।

যুগলবাবু বললেন, তোমাকে ডাকছিলুম—না না, তোমার ওই মাণিককেই বোধ হয় খুঁজছিলুম। মানে, ঠিক মনে নেই—তা, এ বেশ করেছ, বড়বউ। হ্যাঁ—এইটিই চেয়েছিলুম—

বড়বউ সহাস্যে সকুণ্ঠায় বললেন, কি বলছ তুমি?

যুগলবাবু বললেন, তাও ঠিক মনে নেই—নায়েব থাকলে মনে করিয়ে দিতে পারতো!—হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে! আমাদের সেই বিশুর কথাই ভাবছিলুম, বড় বউ! সে হাঁটতে শিখেছিল, খেলা করতো, আমার কাঁধে চ'ড়ে নাচতো! শক্ত নিরেট, পাথরের মতন আমার সেই ছেলে!—এই ব'লে তিনি মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, এইবার ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরও সেই ঢলঢলে মুখ, সেই কালো দুটো চকচকে চোখ—বড়বউ—এই ত—এই ত' আমাদের সেই বিশু! বড়বউ—বড়বউ—তুমি এক কাজ করো—এর নাম রেখে দাও বিশ্বনাথ—বিশু আর বিশ্বনাথ—বেশ মিলবে! আমি সবাইকে ব'লে দিচ্ছি—ডাকো নায়েবকে—আচ্ছা, আমি ডাকছি—নায়েব—নায়েব—। বলতে বলতে মুখ লুকিয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

রাণীমা মাণিককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

৪

এই ঘটনার পর পনেরোটি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ধনী জমিদারের ঘরে মাণিক মানুষ হয়েছে। তার নাম বদল করা হয়েছে; এখন তার নাম বিশু। আজো বিশু তার মাকে খুঁজে পায়নি। দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ ক'রে জমিদারের লোকেরা ফিরে এসেছে।

বিশু বড় হয়েছে। গ্রামের স্কুল থেকে পাশ ক'রে সে এখন কলকাতার কলেজে পড়ছে। সে এখন জমিদার বাড়ীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সবাই তাকে সমীহ করে। সকলেই জানে সে ভাবী জমিদার।

পনেরো বছর অতিত হলেও দেখা যাচ্ছে তেমনই রয়েছে জমিদার বাড়ীর সেই প্রাচীন আবহাওয়া। সেই আমের চারাটি বড় হয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে শাখা প্রশাখায়।

সেদিন আমগাছের নীচে রাণীমা ও বিশ্বনাথকে দেখা গেল। বিশ্বনাথ শান্তভাবে ব'সে রয়েছে। তার কলেজের ছুটি ফুরিয়েছে, এবার সে কলকাতায় চ'লে যাবে।

রাণীমা বললেন, আচ্ছা বিশু, এই ত শুনি, কত লোক হারায়, আবার তাদের খুঁজেও পাওয়া যায়—তুই আর একবার ভালো ক'রে তোর মায়ের খোঁজ খবর কর্না বাবা?

বিশু বললে, খোঁজ খবর এতকাল ধ'রে করলুম—কলকাতায়

কত লোককে ব'লেও রেখেছি! কিন্তু জানো ত' মা—এ নিয়ে বেশী হৈ চৈ করতে পারিনে।

রাণীমা মুখ উজ্জ্বল করে সস্নেহে বললেন, হ্যাঁ, তা বুঝি বৈকি বাবা। তা সে যাই হোক, এবার থেকে যেন আর ভুল হয় না বিশু, এবারে কলকাতায় গিয়ে সপ্তাহে দুখানা চিঠি নিশ্চয় দিবি!

বিশু হাসিমুখে বললে, তোমার কেবল চিঠি আর চিঠি! যদি আমাকে ছেড়ে থাকতে না পারো তবে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলে কেন শুনি?

এমন সময় যুগলবাবু চেঁচামেচি করতে করতে বাগান পেরিয়ে এধারে এসে ডাকলেন, বড়বউ, এর জন্যে তোমরা সবাই দায়ী—যত বিশৃঙ্খলা আর অব্যবস্থা,—সবাই মিলে তোমরা একটা মস্ত গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ছেড়ে দিলে কোনো কাজ সহজে হবার উপায় নেই!

বড়বউ বললেন, কেন, হয়েছে কি?

যুগলবাবু বললেন, কি হয়নি? এই যে তোমার বিশু আজ বাদে কাল কলকাতায় যাবে, তা'র খাওয়া দাওয়া চলাফেরার কথাটা ভেবেছ কি?

বিশু বললে, না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, সেখানে আমার কোনো অসুবিধে নেই।

যুগলবাবু বললেন, আছে বৈকি হাজারো অসুবিধে আছে—তোমার রান্না করবে কে, বিছানা পেতে দেবে কে, চা ক'রে দেবে কে—তোমার খুচরো কাজের লোক কেউ নেই! লক্ষ অসুবিধে!—নাঃ বড়বউ, তোমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না!—ডাকি নায়েবকে—নায়েব, নায়েব!

নায়েবমশাই কাছারি বাড়ীতে বসেছিলেন নানা কাজ নিয়ে,—কর্তামশাইয়ের উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেয়ে তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন।

তাঁকে দেখেই যুগলবাবু যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ-হে—নায়েব, তুমি ভেবেছ কি?

নায়েবমশাই হকচকিয়ে বললেন, আজ্ঞে কি হয়েছে, বলুন?

যুগলবাবু বললেন, হয়নি কি? হয়েছে, একশো বার হয়েছে! এই যে আমার বিশু কলকাতায় যাবে, তুমি তা'র কোনো কথা ভেবেছ?

নায়েবমশাই বললেন, আজ্ঞে, ছোটবাবুর মাসিক টাকাকড়ির বন্দোবস্ত আমি ত' সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

যুগলবাবু বললেন, মাথা কিনেছ!—ব'লে চীৎকার করে উঠলেন। পুনরায় বললেন, টাকা—টাকা—কেবল টাকাই চিনেছ,—সমস্ত জীবনটা কেবল দেনা-পাওনার খাতা খুলে রেখেছ,—ছেলেটা কলকাতায় গিয়ে যে বেঘোরে পড়বে, তা'র কি ক'রেছ শুনি?

নায়েবমশাই হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, আজ্ঞে—

যুগলবাবু বললেন, কেবল আজ্ঞে আর আজ্ঞে! কেবল হাত কচলানো নায়েবিটাই শিখে রেখেছ!

বিশু মায়ের কাছ থেকে স'রে এলো। তারপর বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ঘরে চুরি হবার পর থেকে ঠিক করেছি ঠাকুর-চাকর আর রাখবো না।

রাণীমা বললেন, তাহ'লে তোর সেখানে কেমন ক'রে চলবে?

বিশু বললে, কিছু অসুবিধে হবে না মা,—সেটা যে কলকাতা, চাইলেই সব পাওয়া যায়?

যুগলবাবু বললেন, এই ত চাই,—দেখলে, ছেলেকে কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলেছি?—বলি, দেখলে ত নায়েব, দেখলে ত, এবার বুঝতে পারলে ত'?

নায়েবমশাই সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞে!

যুগলবাবু বললেন, আবার আজ্ঞে? ছাই বুঝেছ, সব ছেড়ে-ছুড়ে কাশী না গেলে তোমরা কোনোদিন কিছু বুঝবে না!—এই ব'লে রাগে গর্ গর্ করতে করতে তিনি চ'লে গেলেন।

পরের দিন সকালেই বিশু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুলো।

গ্রামের পথ, এখানে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোনো সুবিধা নেই। তখন শীতের শেষ—মাঠে মাঠে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। ধুলো উড়িয়ে তা'র গরুর গাড়ী ষ্টেশনে এসে হাজির হোলো।

ট্রেনখানা এলো প্রায় মধ্যাহ্নকালে। রাত্রে গিয়ে কলকাতা পৌঁছবে। বিশু একখানা সেকেণ্ডক্লাস টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠলো। কাছারির লোক আর বরকন্দাজ বিদায় নিল।

প্যাসেঞ্জার গাড়ী প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই থামে—সুতরাং ভ্রমণটা কিছুটা বিরক্তিকর। যাই হোক একখানা ইংরেজি মাসিকপত্র খুলে নিজের মনে বিশু হেলান দিয়ে বসে রইলো। কতক্ষণ ব'সে রইলো একভাবে বই মুখে নিয়ে, আর একটির পর একটি ষ্টেশনে গাড়ী থেমে আবার চলতে লাগলো।

প্রায় বেলা অপরাহ্ণ। এমন সময় কি যেন একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো। সামনে একটা চা-ওয়ালাকে দেখতে পেয়ে বিশু গাড়ী থেকে নামলো—ব'সে ব'সে তা'র হাত পা যেন জড়িয়ে গেছে।

সবেমাত্র চা-ওয়ালার হাত থেকে এক পেয়ালা চা নিয়ে সে মুখে দিয়েছে এমন সময় দূরে একটা ভীষণ হৈ চৈ শুনে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। দেখলো একটি লোক লাইনের পর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তার দিকে আসছে। লোকটা কেবল চীৎকার করছে এই ব'লে,—পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? মামন্তুসর!

পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? মামনুসর ! মামনুসর ! লোকটার পরণে গেরুয়া, একমুখ দাঁড়িগোঁফ, কপালে মস্ত সিঁদুরের টানা, হাতে কি যেন একটা।

বিশু একটু উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাকালো—দেখলো সবাই ছুটোছুটি করছে। কিন্তু তা'র কি করা উচিত এই কথা ভালো ক'রে ভাববার আগেই সেই কাপালিকের মত লোকটা ছুটে এসে তা'র সেই বীভৎস দাঁত বা'র ক'রে হাসিমুখে বললে, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? মামনুসর !

ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিটবাবু, কুলি—সবাই ছুটোছুটি করছে। সকলে ভয়ে তটস্থ। ওধার থেকে একজন চেঁচাচ্ছে—পালাও, পালাও, পুলিশ—

পাগল আবার বললে, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

বিশু চীৎকার ক'রে বললে, কি—কি—বলছেন ?

পাগল উচ্চ হাসি হেসে বললে, এসো—কথা আছে ! আড়ালে বলবো।—

তারপর বিশুকে কতকটা পথ টেনে নিয়ে গিয়ে সে বললে, ইয়া, এইত চাই ! তা বেশ। আহা, কদ্দিন পরে দেখা !—প্রায় হাজার দশেক বছর হোলো, না ?

বিশু আঁৎকে উঠে বললে, অ্যাঁ—আমায় ছেড়ে দিন—

পাগল অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মতো বললে, আরে ভাই—দাঁড়াও না —মজার কথা আছে।

বিশু বললে, মজা ! কিসের মজা ? কে তুমি ?

পাগল হেসে বললে, আরে সাংঘাতিক মজা !—এই ভ্যাখো না, আমার কথায় সূর্য উঠলো, আমারই কথায় এই তোমার গাড়ী থামলো ! যাবে কোথা ?

বিশু বললে, কি—মানে—?

পাগল বললে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তাই ত তোমার সঙ্গে দেখা! দাঁড়াও—চুপটি ক'রে দাঁড়াও। কাজের কথা শোনো। বলি, তোমাকে যে-কাজে পাঠালুম, তার কি ক'রলে?

বিশু বললে, কাজ—কিসের কাজ—?

পাগল বললে, কেন, এই ত বুদ্ধ—বুদ্ধকে পাঠালুম—অহিংসা দিয়ে গেল! চৈতন্য—চৈতন্যটা কিছু না! শুধু প্রেম দিয়ে পালিয়ে গেল—কিন্তু—একটা ধর্ম তৈরী করে দিলে—তুই—তুই ছোঁড়া যা তাই রয়ে গেলি। একেবারে অপদার্থ। তোর দ্বারায় কিচ্ছু হোলো না—না কিচ্ছু হোলো না! তা—আয় কাছে আয়। মাথাটা দে—ভয় কি? এই ব'লে হাতের ছুরিখানা বা'র ক'রে বললে, খুলিটা অস্ত্র করে দিই আয় আয়—

বিশু বললে, না, না, ছাড়ুন, ছেড়ে দিন।

পাগল হিংস্র আনন্দে বললে, আয়—আয় খুলিটা অস্ত্র করে দিই—শক্তি পাবি কি ক'রে?—হারা হারা বোম্ বোম্—

প্রথমটা বিশু তা'র সঙ্গে ঝটাপটি করলো, তারপর অগত্যা তা'কে শক্তি প্রকাশ করতে হলো। ছুরিসুদ্ধ পাগলের ডান হাতখানা ধ'রে তা'কে একটা ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে দিল। পাগলটা তখনই হুমড়ি খেয়ে উঠে চীৎকার করলো, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? মামনুসর।

বিশু আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সামনের একখানা কামরায় উঠে লুকিয়ে পড়লো।

পাগল তখন চীৎকার করছে—মেরেছিস কলসীর কানা, তা ব'লে কি—

এমন সময় ওদিক থেকে একটি তরুণী টিকিট ঘর থেকে টিকিট ক'রে যখন এগিয়ে আসছে সেই সময় সহকারী মাষ্টারমশাই দৌড়ে এসে বললেন, দেখুন, শিগগির আপনি গাড়ীতে উঠে পড়ুন?

তরুণী মুখ তুলে বললে, কেন ?

মাষ্টারমশাই বললেন, একটা পাগল এদিকে ঘোরা ফেরা করছে—

পাগল !

হ্যাঁ—এই কাছেই পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে—আপনি—আপনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়ুন—

তরুণী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে ? যদি—

মাষ্টারমশাই বললেন, না, না, ভয় নেই—আপনি শিগগির গাড়ীতে উঠে পড়ুন—এই যে—এই গাড়ীটা একেবারে খালি—

তরুণী বললে, কিন্তু—কিন্তু ধরুন একলা খালি গাড়ী পেয়ে পাগলটা যদি এসে পড়ে ?

সহকারী মাষ্টারমশাই বললেন, আপনি উঠে পড়ে গাড়ীর দরজাটা ভালো ক'রে বন্ধ করে দিন—তা ছাড়া আমরা আছি—পাগলটা যাতে গাড়ীতে না উঠতে পারে আমরা দেখবো !

আচ্ছা, ধন্যবাদ !—ব'লে তরুণী গাড়ীতে উঠে একটি বেঞ্চ দখল ক'রে বসলো সুস্থ হয়ে। তরুণীর নাম নিরু। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়েছে। গাড়ী বেশ চল্‌ছে ! নিরু সহজ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সহসা তার পায়ের আঘাত লাগলো বিশুর গায়ে। বিশু ভয়ে তখন বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে ছিল। নিরু চমকে উঠতেই বিশুর পক্ষে অমনভাবে আত্মগোপন করে থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো। হুমড়ি দিয়ে পড়ে থাকা আর চলে না বুঝে বিশু বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই ধাক্কা লেগে একটা জলের কুঁজো প'ড়ে ভেঙ্গে গেল—জল ছড়ালো এদিক ওদিক। নিরু শিউরে চম্‌কে চেঁচিয়ে উঠে বললে, অ্যাঁ, সেই—সেই পাগলটাই—

বিশু উঠে থতমত খেয়ে বললে, আমি পাগল! কী বলছেন পাগলের মতন? এই বলে সে বেঞ্চের অপর দিকে সরে দাঁড়ালো।

ভীত উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে নিরু বিবর্ণ মুখে তাকালো—কি যে করবে, ভেবে পেলো না। কিন্তু উদ্বিগ্ন চঞ্চল ভাবে সে উঠে দাঁড়িয়ে অনেকটা যেন আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো।

বিশু তার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে হাসিমুখে বললে, আপনি ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই!

নিরুর ভয় বেড়ে গেল! সে বললে, না, ভয় পাইনি—কই, ভয় ত' পাইনি? কিসের ভয়? ভয়ের কিছু নেই!

বিশুর ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল, মুখখানা রাঙা, চোখে অপরাধীর ভাব। কিন্তু তবু সে সবিনয় হাস্যে বললে, তবু আপনি ভয় পাচ্ছেন মনে হচ্ছে কিন্তু আমি পাগল নই!

নিরু তা'কে একপা এগোতে দেখেই ভীত কণ্ঠে বললে, না, কে বলেছে তুমি পাগল?—কই না, তুমি ত' পাগল নও—তুমি বেশ লোক, ভালো লোক—কিন্তু—

বিশু এবার কৌতুক বোধ ক'রে বললে, কিন্তু কি বলুন?

আড়চখে অস্বস্তিভরে নিরু তা'র দিকে তাকালো। বললে—না, না কিছু নয়,—কিছু বলিনি তো। কিন্তু—কিন্তু তুমি ওইখানেই থাকো—

বিশু এবার হা হা করে হেসে উঠলো। বললে, আপনি যেন পাগলকেই শান্ত করছেন। কিন্তু আমি বলছি, আমি সত্যই পাগল নই। আপনাকে স্পষ্ট ক'রেই বলি—

নিরু চঞ্চল হয়ে বললে, না,—না না—থাক্‌ স্পষ্ট ক'রে আর বলতে হবে না—অস্পষ্ট কিছু নেই—!

বিশু শান্ত হাসিমুখে আবার বললে, শুনুন, মিছেমিছি ভয়

পাচ্ছেন—আমি যে তখন বেঞ্চের তলায় লুকিয়েছিলুম সে কেবল—

নিরুর মনে হোলো লোকটা কেবল পাগল নয়, গভীর শয়তান। সে চেঁচিয়ে বললে, আমি নামতে চাই!

বিশু বললে, ও কি, কি করছেন? অকারণে চেন্ টানবেন না—পঞ্চাশ টাকা ফাইন হবে।—দাঁড়ান, এক্ষুনি গাড়ী থামবে পরের ষ্টেশনে!

নিরু হতাশভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত গুন্‌তে লাগলো।

বিশু বললে, ওঃ, আপনি যা করছেন—পাগল ত' পাগল বাঘ-ভাল্লুককে দেখলেও লোকে এত ভয় পেতো না। অচেনা জায়গায় আপনি কেন মিথ্যে নামতে চান?

নিরু চঞ্চলভাবে বললে, হোক, অচেনা হোক—আমি নামবো, আমার দরকার!

এমন সময়, প্যাসেঞ্জার গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এলো। গাড়ী-খানা ধীরে ধীরে একটি ষ্টেশনের প্লাটফরমের ধারে এসে দাঁড়ালো। দরজাটা খুলে নিরু নামবার উদ্যোগ করতেই বিশু এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললে, শুনুন, আপনাকে নামতে হবে না! অচেনা দেশে আপনার কোনো দরকার থাকতে পারে না, আমি জানি। আমিই নেমে যাচ্ছি!

এই ব'লে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে দিব্যি সহজ সুস্থ ব্যক্তির মতো বিশু প্লাটফরমে নেমে পড়লো। তারপর দরজার কাছে দাঁড়িয়েই সে বললে, আচ্ছা নমস্কার—কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, কিন্তু দেখুন—হ্যাঁ—একটা কথা—

নিরু সবিস্ময়ে তাকালো! ট্রেণের বাঁশী বাজলো। বিশু বললে, একটা কথা, কথাটা বার বার মনে হচ্ছে—। ক্ষমা করবেন!

আমার গায়ে তখন আপনার পা লেগেছিল, তা'র জন্তে পায়ে আপনার লাগেনি ত ? আচ্ছা নমস্কার।

নিরু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

ট্রেণ ছেড়ে দিল।

৫

কলকাতার কলেজগুলি থেকে সেই সময় কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রীকে নিয়ে একটি অভিনয় করার চেষ্টা চলছিল। দিন আর বেশী নেই, এই বেলা মহড়া না দিলে সময়মতো সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযোগী ক'রে ছেলেমেয়েদের গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে না—এই মনে ক'রে একটা তাড়াহুড়ো প'ড়ে গেছে।

ভালো ক'রে মহড়া দেবার জন্য সুরমা-দি নিজের বাড়ীর নীচের তলাকার বড় হল ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া নিজেও কতকটা মেয়েদের তৈরী ক'রে দেবার ভার নিয়েছিলেন। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তেমন বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না ব'লে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। একদিন তিনি সকলকে তিরস্কার ক'রে বললেন, তোমরা ভাই কেউই আমার কথা শুনছো না—আজ বাদে কাল নাটক প্লে হবে—কিন্তু তোমাদের কারো গা-ই নেই।

সুরমা-দির কথার উত্তরে একটি মেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়নায় নিজের মুখের টয়লেট্ দেখে বললে, হ্যাঁ, কি বলছেন, সুরমা-দি ?

সুরমা-দি বিরক্ত হয়ে বললেন, কথা ভাই তোমাদের কানে ওঠে না—সেই থেকে ব'কে ব'কে সারা হলুম—এই যে, অলকা—তোমার পার্ট মুখস্থ হয়েছে ত ?

অলকা বললে, না সুরমাদি, এবারেও উইক-এণ্ডে আমাদের অডিটিং ছিল কিনা, তাই সময় হয়ে ওঠেনি।

সুরমা-দি বললেন, তবে ভাই তোমাদের ওই ছাইভস্ম নাটক আর প্লে হবে না। কেবল তোমাদের অডিটিং, কেবল পিকনিক, —এই দেখো না, নিরুকে বললুম, তোমাকে হিরোয়িনের পার্ট নিতে হবে—নিরু অমনি নিরুদ্দেশ হলো—

কথাটা তাঁর শেষ হয়নি, এমন সময় ঝড়ের মতো নিরু এসে উপস্থিত।

নিরু হাসিমুখে বললে, না সুরমাদি, নিরুদ্দেশ হইনি—একটু কাজ ছিল, তাই দিন দুয়েকের জন্যে বাড়ী গিয়েছিলুম।

সুরমা-দি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, বেশ, তোমাকে পাওয়া গেল, এবার নিভার তোষামোদ করিগে। আমার হয়েছে যত মাথা ব্যাথা! বলতে বলতে তিনি চ'লে গেলেন।

ইলা বললে, এই নিরু, তুই হিরোয়িনের পার্ট্ করবি, গলা শুকিয়ে যাবে না ?

নিরু বললে, গলা শুকোবে কেন ?

ইলা বললে,—আরে, হিরো সাজবে যে আমাদের চ্যাটার্জি দি গ্রেট্!

নিরু ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললে, কে আবার তোদের চ্যাটার্জি দি গ্রেট্ ?

ইলা বললে,—হুঁ, অত বড় স্কলার, আই-এস-সিতে ফার্ষ্ট হলো—তার নামটাও তোর কাণে ওঠেনি ? দেখবি—তার সামনে অভিনয় করতে গিয়ে ভয় পেয়ে মরবি!

নিরু বললে, ভয়! কিসের ভয়? অভিনয় করতে ভয় কিসের?

রেবা বললে, না ভাই না, আমি ওই জন্যেই কোন পার্ট নিইনি। আমার ভাই ভয় করে ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করতে। যদি হঠাৎ হাত ধরে?

লাবণ্য বললে, আমারো ভাই ভয় করে। যদি কোনো বেফাঁস কথা ব'লে বসে?

নিরু বললে, তোদের এক কথা! অভিনয় করবো, অত ভয় কিসের। আমার ভাই অত ভয় টয় নেই—ভয় পেলে কোনো কাজই হয় না।

ঠিক সেই সময় সহসা অদূরে বিশুকে দেখে সকলে সবিস্ময়ে আনন্দে গুঞ্জন ক'রে উঠলো! নিরু কিন্তু বিমূঢ় আতঙ্কে ব'লে উঠলো, ও কি—অ্যাঁ—ওই যে সেই—

রেবা বললে, কি রে, কি বল্‌ছিস?

নিরু বিস্ফারিত চক্ষে বললে, ওই ত সেই, সেই ট্রেণে—সেই—

ইলা চুপি চুপি বললে, আরে ওই ত' চ্যাটার্জি দি গ্রেট্—ওর কথাই তোকে বলছিলুম—তুই চিনিস নাকি?

নিরু থতমত খেয়ে বললে, না—মানে—ঠিক চিনিনে—তবে, হ্যাঁ—আমি যাই—

বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল একপাশ দিয়ে। দরজা পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ঘুরে সে যখন বাইরের দিকে এসেছে, সেই সময় কোথা থেকে এসে বিশু বললে, এই যে, ভাল আছেন ত? নমস্কার!

নিরু কুণ্ঠিতস্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ—আপনি—!

বিশু বললে, হ্যাঁ। মানে—সেই আমি।

নিরু বললে, আপনি তাহলে—বলতে বলতে মুখখানা একটু রঙীন হ'য়ে উঠলো।

বিশু বললে, না, পাগল আমি নই—সুস্থকায় একটি ভদ্রলোক!

—এই ব'লে সে হাসলো। হেসে পুনরায় বললে, সেদিন ট্রেণে অকারণে আপনি ভয় পেয়েছিলেন!

নিরু নিজেকে কতকটা সামলে বললে, সেদিন অনেক অন্যায় হয়ে গেছে, কিছু মনে রাখবেন না!

বিশু হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, না না, ও কিছু ভাববেন না—আপনি বসুন, ওদিকে আমি রিহার্সাল কদ্দুর এগুলো দেখে আসি।

—এই বলে বিশু সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে মেয়েরা ততক্ষণে একটু সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এর পিছনে যেন কোথাও কিছু একটা আছে, এইটিই তারা আঁচ ক'রে নিল ইতিমধ্যে।

নিরু ফিরে আসতে লাবণ্য বললে, আগে থেকে তোদের দুজনের ভাব ছিল, কি বলিস?

অলকা বললে, হ্যাঁ, চ্যাটার্জ্জি কিন্তু ঢং দেখিয়ে গেল খুব। ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

রেবা বললে, তাহলে এটা নিতান্ত অভিনয় না রে নিরু?

নিরু বললে, আমি ভাই আগে চিনতুম না ওঁকে!

রেখা বললে, তা বেশ, এখন চেনাচিনি দেখে খুশী হলুম। কি বলিস, সুনন্দা?

সুনন্দা বললে, যা বলেছিস! "পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

নিরু হেসে বললে, যা পোড়ারমুখী, কী যে বলিস।

অলকা বললে, কী আর বলব ভাই? সুধু বলি, "রাখালী লো রাখালী, কত রঙ্গ দেখালি!"

ওপাশে তিন চারিটি ছাত্র ব'সে ব'সে কাণাকাণি করছিল।

তাদের মধ্যে একজন বললে, তোর বন্ধুর ব্যাপারটা দেখলি? আজকাল বেশ ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে!

ধীরেন বললে, আরে নে, খেলোই বা একটু জল—সাঁতারটা ভালো জানলেই হোলো—ডুবে না যায়।

হরেন বললে, আরে, ডুবে গেলেও ডুববে না—চৌকস ছেলে—ডুব-সাঁতার জানে!

ওদের সবাইকে এড়িয়ে নিরু আর বিশু কতকটা যেন ঘনিষ্ঠের মতো আলাপ ক'রে চলেছে। কথাবার্তার শেষে নিরু বললে, বেশ ত, তাহলে আসুন না আমার গাড়ীতে—আপনাকে পৌঁছে দেবো?

বিশু সপ্রতিভভাবে বললে, কিন্তু—

নিরু বললে, না, না, অসুবিধে হবে না—আসুন।

বিশুর আর আপত্তি করবার কিছু রইলো না। সে নিরুর গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলো। নিরু হাসিমুখে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ী ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো ভবানীপুরের এক পাড়ায়।

বিশু বললে, আমার জন্যে আপনার কতখানি দেরী হয়ে গেল।

নিরু হেসে বললে, তা হোক, কত গল্প করলুম দুজনে।

বিশু বললে, আচ্ছা এবার আমি নামবো,—ওই ল্যাম্পপোষ্টের কাছে গাড়ী থামান্—

গাড়ী এসে থামলো একখানা বাড়ীর সামনে। বিশু নেমে পড়লো। কিন্তু সেই সময় পিছন থেকে ডেকে নিরু বললে, দাঁড়ান্—সেদিন আপনাকে 'পাগল'—'তুমি'—আরো কি যেন সব বলেছিলুম, মনে আছে ত?

বিশু হেসে বললে, হ্যাঁ, আছে বৈ কি,—

নিরু বললে, বেশ, তার জন্যে একদিন আপনার বাসায় চড়াও হয়ে, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাবো। কেমন ?

বিশু হেসে বললে, বেশ ত ? এলে খুশীই হবো।

নিরু হাসিমুখে আবার গাড়ী ছুটিয়ে দিল। বিশুর সঙ্গ ছাড়বার পরমুহূর্ত থেকে নিরু উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছে—একটা অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত, অসহ্য উল্লাস এলো তা'র সর্বাঙ্গে। সহসা আপন উদ্দীপনাকে অপব্যয় করার জন্য সে দ্রুত উন্মত্তবেগে মোটরখানা চালিয়ে, গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে, দুলিয়ে, পাক খাইয়ে, যেখানে সেখানে যেমন তেমন ক'রে বেঁকিয়ে যেন নিজেকেই সে বিদীর্ণভাবে প্রকাশ করতে লাগলো।

অবশেষে সে বাড়ীর ধারে এসে গাড়ী থামিয়ে ঝাঁপিয়ে নামলো। সামনে তার পোষা একটি লোমবহুল বিড়াল বসেছিল,—নিরু তাকে লুফে তুলে নিয়ে অধীর আবেশে আদর জানিয়ে উঁচুতে তুলে আবার ঝপ ক'রে নামিয়ে ছুটে চললো একটা গানের কলির সুর নিয়ে—। চললো ভিতরে।

ভিতরে একটি সুসজ্জিত কক্ষে সৌম্যদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সহাস্য এক বৃদ্ধ আপন মনে "patience" খেলছিলেন। নিরু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটা ওটা নাড়াচাড়া করে আওয়াজ করলো,—কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে পূর্বেকার সঙ্গিতের সুরটিই ধরলো হাসি মুখে—বৃদ্ধের চমক ভাঙলো,—সস্নেহ মধুর দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন। নিরু কাছে এগিয়ে এলো।

নিরু ডাকলো, দাদু !

দাদু চশমা সরিয়ে মাথা তুললেন !—বললেন, এই যে, এ আবার

নতুন কি শুনি? 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে!' বলি, ব্যাপার-খানা কি, বল দেখি দিদি?

নিরু বললে, ব্যাপার আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু!—ব'লেই সে ভ্যানিটি ব্যাগটা ছুঁড়ে একধারে ফেলে দিল।

দাদু সহাস্যে বললেন, তাই নাকি? মাথাটা ঘুরে গেল, না মুণ্ডু কাটা গেল,—কোন্‌টা?

নিরু দু হাতে দাদুর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে, দাদু কি বল্‌ব তোমাকে—একদম ম্যাজিক্‌—যাকে তুমি বলো, রূপ-কথার ইন্দ্রজাল!

দাদু হাসিমুখে বললেন, বটে—তাহলে বল্‌ রিহার্সালটা বেশ জমিয়েছিস্‌?

নিরু হেসে জানালার ধারে সরে গেল, তারপরে দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকাল। সেখান থেকে এলো আয়নার কাছে। দাদু তার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে বললেন, হুম্‌। লক্ষণ ভালো নয়—সাপে কামড়েছে! ডাক্তারের দরকার।

নিরু সকৌতুকে বললে, ডাক্তার কেন দাদু, তুমি মন্তর পড়ে বিষ নামাতে পারো না?

দাদু বললেন, হা ভগবান, কাল কেউটের বিষ, ওকি মন্তরে নামবে? নাঃ—আমার কপাল পুড়লো দেখছি! বলি নায়কটি কে শুনি?

নিরু কপট গাম্ভির্য্যে বললে, দাঁড়াও বলছি! এই ধরো তার পরণে বাঘের ছাল, গলায় সাপের মালা, মাথার জটায় গঙ্গার ধারা—যাঁকে তুমি বলো, তোমার দেবাদিদেব বিশ্বনাথ।

দাদু বললেন, বটে! মনে হচ্ছে তোর গলার আওয়াজে কাঁপন লেগেছে, চোখে চাঞ্চল্য, হাতে পায়ে নদীর জোয়ার—তা হ'লে উপসর্গ মিলছে কেমন?

নিরু চোখ নামিয়ে বললে, কি যে বল তুমি দাদু!—মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে।

দাদু বললেন, দিদি, গান্ধর্ব মতেই বলছি! এবার তাহলে শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ! যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদং মিদং—কেমন?

নিরু খিল খিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়লো!

দাদু বললেন, তারপরে আদ্যিকালের মালাবদল! তারপরে তুই চিঠি দিবি তাকে? ঠিকানার পাশে লিখবি 'যাও পাখী ব'লো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে!' ওপিঠে লিখবি 'সাড়ে চুয়াত্তরের দিব্যি, মালিক ভিন্ন কেহ পত্র খুলিবেন না।'—কেমন?

নিরু হেসে বললে, দাদু, তোমাদের কালে বুঝি তোমরা এই সব কীর্তি করতে?

দাদু বললেন, ওরে দিদি, এসব কীর্তিকাহিনী সেই আদ্যিকাল থেকে চ'লে আসছে। সেকালের ফুল একালেও ফোটে—সেই একই গন্ধ! সেই একই নদী বয়ে চলে আজও একই গান গেয়ে।—এই যে আজ তোর চোখে মুখে রংয়ের আবেশ লেগেছে, প্রাণের ঢেউ উঠেছে তোর চলাফেরায়—এটা আগের দিনও ছিল রে, দিদি ছিল!—ওকি, পালাস্ কেন?

নিরু বললে, দাদু যেন কী—অস্ফুটস্বরে ব'লে সে চ'লে গেল!

দাদু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

নব অনুরাগিনী রাজহংসীর মতো লীলায়িত গতিতে নিরু বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। তার চোখে, তার হাতে, তার সর্বাঙ্গের ভাষা হোলো, 'হে পৃথিবী, তুমি সুন্দর,—যা কিছু সব সুন্দর!' তার গতি ত্বরিত নয়, কিন্তু স্খলিতও নয়।—সে যেন সঙ্গীতরূপিনী হ'য়ে উঠেছে।

মাঝসিঁড়ির বারান্দাপথে সে এসে দাঁড়ালো। জানালার বাইরে দশমীর বিপুল জ্যোস্নালোকের স্বপ্ন—সেই স্বপ্ন নিবিড় হ'য়ে এলো তার চোখে। সে গান গাইতে লাগলো।

নীচে গানের সুরে দাদু আনমনা হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের সামনে নিরু—নিরুপমার অন্তরের আবেদন যেন প্রকাশমান হ'য়ে উঠলো। তিনি বাইরে এলেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন, নিরুপমার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন মুগ্ধ হয়ে।

নিরুপমার গান যখন থামলো, দাদু তখন কাছে গিয়ে বললেন: দিদি, কি আশ্চর্য তোর গান, এমন ক'রে ত কোনো-দিন গাস্‌নি।

এই ব'লে তিনি নিরুর মাথার উপর স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন।

৬

ঘন মেঘে সেদিন বর্ষার চেহারা দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টির আভাষ—অন্ধকারের আচ্ছন্ন ছায়া—চাপা চাপা বাতাসের বেগ—ঝড়বৃষ্টির সঙ্কেত। বিশু ঘরে একলা। মনোভাব—"যদি সে আসতো—এমন ঘনঘোর মেঘের আর অন্ধকার অবেলায়—" বিশু একটু অস্বস্তিবোধ করে, একটু অশান্ত—একটু অপেক্ষামান—

নিরুর কণ্ঠস্বর যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—"আপনার বাসায় চড়াও হবো, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাবো।"

বিশু হাসিমুখে সহসা মুখ ফিরিয়ে বলে, আরে, আপনি আসুন, আসুন—কী সৌভাগ্য আমার! আপনার কথাই ভাবছিলুম—বসুন—ইয়া, ঠিক হয়েছে!—কিন্তু এই যা—আর ত' জানিনে—এর পরে কি বল্‌ব? কী কথা ব'লে কথা আরম্ভ করতে হবে?

বিশুর মুখের এই কথাগুলো শুনলে হঠাৎ মনে হতে পারে যে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় একজন নিশ্চয়ই উপস্থিত। কিন্তু আসলে তখন ঘরের মধ্যে বিশু ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে যে নিরু একদিন পাগল ব'লে ঠাউরেছিল, সেটা মিথ্যে নয়।

এমন সময় বাইরে কার কড়ানাড়ার শব্দ হ'তেই বিশু বললে, কে?—এই রে, সত্যিই বুঝি তিনি এসেছেন!—কে? এই ব'লে এগিয়ে দরজাটা খুলতেই জিতু আর শ্যাম এসে ঢুকলো হাসিমুখে।

বিশু বললে, ধ্যেৎ তেরি মূর্তিমান গন্ড—

জিতু বললে, বিশু তুমিই ত ওকে ব'লে ক'য়ে মামার কাছে পাঠিয়েছিলে—এবার নাও এনেছি ওকে ধ'রে—

বিশু শ্যামকে প্রশ্ন করল, বল্‌ তোর মামার সঙ্গে কি হয়েছে এবার খুলে বল্‌!

শ্যাম বললে, সোজা মামার কাছে গিয়ে বললুম, মামা চাকরি দাও! মামা বললে, সে কি, এটা কাঠের কারবার, কাজকর্ম শিখে আসতে হয়! তাছাড়া শুনেছি তুই একজন কবি—তোর কবিত্ব এখানে কি কাজে লাগবে রে?

বিশু বললে, তুই কি বললি?

শ্যাম বললে, মামাকে বললুম, মামা, তোমার এই শুকনো কাঠেই আমি ফুল ধরাবো!—মামা অবাক্‌!

জিতু হেসে বললে, তারপর?

শ্যাম বললে, তারপর—মামাকে যথারীতি শুনিয়ে দিলুম আমার আরেকটা সাম্প্রতিক রচনা—

এই ব'লে সে কবিতার খাতা বার করে পড়তে সুরু করল।

জিতু বললে, এই সেরেছে! এখন সামলা?

বিশু বললে, তুই ত ওকে খোঁচালি! এখন তুই সামলা!

শ্যাম বললে, শোনো মন দিয়ে শোনো—এর নাম, 'লাল ধোঁয়া' —রচয়িতা শ্যাম লাহা। গ্রন্থকার কর্তৃক এর নাট্যস্বত্ব, সিনেমাস্বত্ব, গ্রন্থস্বত্ব, রেকর্ডস্বত্ব ইত্যাদি সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

জিতু বললে, মর্মান্তিক!

শ্যাম তা'র কবিতাটি অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলো:

কাঠের গোলায় শুনি অরণ্যের কান্না,
তা'র সঙ্গে চৌরঙ্গীতে মেয়েদের
    লিপষ্টিক্ মাখা ঠোঁট আর
    হিল্ তোলা পাদুকার খট্‌খট্ শব্দ।
আগুনের মতো নীল তা'র শাদা চোখ,
যেন হলদে ডিমের থেকে কালো পাখী
ছুটে আসে ঠিক যেন লাল তুষার!
শুধু বেকার যুবক চেয়ে থাকে
রোগা চোখে বাতায়ন পথে!

বিশু আর জিতু দুজনে হাসতে হাসতে কি যেন ইসারা করলো, তারপর জিতু শ্যামকে ঠেলে বললে, বাঃ চমৎকার—এবার চলো ত লক্ষ্মীটি—চলো যাই বেড়িয়ে আসিগে—

বলতে বলতে জিতু তা'কে জোর ক'রে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের বিদায় নেবার পর বিশু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে এসে জান্‌লাটা খুলে দিয়ে বসতে যাবে—এমন সময় আবার দরজার আওয়াজ। দরজা খোলার পর আর একটি বন্ধু প্রবেশ করলো।

বিশু বললে, ওঃ তুই?

বন্ধু বললে, হ্যাঁ আমি! খুব নিরাশ হয়ে গেলি দেখছি?

বিশু বললে, হবারই কথা। পদ্মবনে মত্ত হস্তীর প্রবেশ হ'ল যে!

বন্ধু বললে, বটে! বিরহী যক্ষের মতন ব'সে তাহলে সেই মেয়েটির কথাই ভাবছিলি—কেমন?

বিশু বললে, কেমন ক'রে বুঝলি?—এই ব'লে সে হাসলো।

বন্ধু বললে, তোমার ওই মধুর হাসিই তা'র প্রমাণ!—তা বেশ, মেয়েটিকে কেমন মনে হচ্ছে?

বিশু বললে, কেমন মনে হচ্ছে, বল দেখি?

বন্ধু একটু হেসে জবাব দিল, "কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা—।" এই না?

বিশু বললে, কি উত্তর চাস, শুনি?

বন্ধু বললে, আচ্ছা থাক্—বুঝলুম—মনে মনে রঙে রসে জাল বুনছিস!—তা কদ্দূর এগোলি? প্রথম পর্ব শেষ?

বিশু বললে, মানে?

বন্ধু বললে, মানে অকারণে হাসি, বাঁকা চোখে চাওয়া, গদগদ ভাষা, চাপা চাপা নিশ্বাস—

বিশু বললে, নাঃ তোরা দেখি ঝড়ের আগেই দৌড়স—!

বন্ধু বললে, আমাদের ভাই দোষ কি? তুমিই রেলগাড়ীতে পাগল সাজলে, মোটরে চ'ড়ে ঘুরে বেড়ালে,—এখন আবার দেখছি পাগল হ'য়ে একলা একলা ঘরে ব'সে হা-হুতাশ করছ! ঝড় ত' তুমিই তুললে!—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ালো। পুনরায় বললে, তা বেশ, ঝড় তোমাদের চলুক—আমি এখন চললুম। এবার ব'সে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবো, কবিতা লেখো, গান বাঁধো, —এসব যদি না পারো, মেয়েদের মতন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদো!—বলতে বলতে বন্ধু হতাশভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশু হো হো ক'রে হেসে ঘর ভরিয়ে তুললো।

ঠিক সেই সময় পুনরায় তা'র ঘরে কে কড়া নাড়লো। বিশু ভাবলো, বটে, এরা চক্রান্ত করেছে আমার বিরুদ্ধে। দাঁড়াও—এই ব'লে সে আস্তিন গুটালো। পরে চেঁচিয়ে উঠল, কে? কি চাই?

আবার দরজায় আওয়াজ!

বিশুর বুকের ভিতরটা ধক্ ক'রে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো। কিন্তু সহসা নিরুকে দেখে সে হতবিস্ময়ে বলে উঠল,—আরে এই যে! আপনি?—আসুন!

নিরু ভিতরে এসে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, আপনি বুঝি এখানে একলা থাকেন? আত্মীয়রা?

বিশু বললে, তাঁরা দেশে!—বসুন।

নিরু বললে, থাক্, আপনাকে আর খাতির করতে হবে না!

বিশু বললে, বারে, আপনাকে খাতির করবো ব'লে কতগুলো কথা গুছিয়ে রেখেছিলুম যে!

নিরু বললে, হয়েছে, থামুন। এখন কাজের কথা শুনুন, যে জন্যে এসেছি!

বিশু বললে, কোনো কাজ নিয়ে আপনার আসার কথা ছিল না ত?

নিরু ভ্রুভঙ্গী করে বললে, ও তবে বুঝি ভেবেছেন আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি? সেটি কিন্তু হচ্ছে না!

বিশু সহাস্যে বললে, বেশ, তা হলে আপনার রাজকার্যটা কি শুনি?

নিরু দমকা হাওয়ার মতন বলে উঠল, শুনলে ঠাট্টা করবেন আমি জানি। কিন্তু সত্যই বলছি, আপনাদের ওই আজগুবী নাটকে আমি হিরোয়িন সাজতে পারবো না।

বিশু সবিস্ময়ে বললে, আরে, আমিও যে এই কথা জানিয়ে এসেছি।

নিরু কৌতুহল ভরে জিজ্ঞাসা করল, কি জানিয়েছেন ?

বিশু বললে, বলেছি হিরোর পার্ট আমার দ্বারা হবে না ! তাহলে দুজনেই আমরা স'রে পড়লুম, কেমন ?

নিরু বললে, হ্যাঁ, সেই ভালো। ওদের নাটক যা হয় হোকগে। আমাদের সামনে বি-এ পরীক্ষা এসে গেছে।

বিশু বললে, আপনাকে—মানে, আপনাকে একটু—এই ব'লে সে চারিদিকে নিরুপায়ের মত তাকালো !

নিরু বললে, আমাকে কি ? কি বলছেন ?

বিশু বললে, না, কিছু না।—হুঁ—ন্-না—কোন অসুবিধে নেই। আপনাকে একটু চা খেয়ে যেতে হবে—হ্যাঁ, ঠিক চা দিতে পারবো ! হ্যাঁ, একটু—একটু দাঁড়ান, ওকে ডাকি, ওই আমার চাকরটাকে—মানে, কী যেন ওর নাম ? হ্যাঁ—মনে পড়েছে।—বনমালী ? ওরে—বনমালী, বনমালী—দু পেয়ালা চা তৈরী কর্‌ত !

নিরু ভ্রূকুঞ্চণ ক'রে বললে, বেশ ত, চা করবে বনমালী ! এর জন্যে আপনার এত হৈ চৈ কেন ? আপনি স্থির হোন্।

বিশু বললে, মানে না, না, কৈ, কিছু না। চাকরটা কানে একটু খাটো কিনা—ওকে কান ধরে না দেখালে কিছু বোঝে না ! আপনি একটু বসুন—কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধে হবে না।—বনমালী, বনমালী।—

বলতে বলতে সে এঘর থেকে গিয়ে ওঘরের পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলো। সে-ঘরটিতে জনপ্রাণী নেই; অথচ সেই ঘরে দাঁড়িয়ে বিশু কল্পিত এক ব্যক্তিকে তিরস্কার ক'রে বলতে লাগলো, ব্যাটা, চোখের সামনে থেকে যাস কোথায় ? নে, চায়ের জল চড়িয়ে দে।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু' পেয়ালার মতন—আর সব ব'লে দিতে হবে !—ইয়া, ঠিক হয়েছে।—জল ফুটলে বলবি।

এই ব'লে সে আবার সহজ মুখে বেরিয়ে এলো। এসে বললে, বুঝলেন, নতুন চাকর কিনা,—চা করতেও জানে না।

নিরু বললে, এবার আপনি স্থির হয়ে বসুন।

বিশু বললে, হ্যাঁ,—এই যে! বসবার কি যো আছে!

নিরু বললে, ওদিকে তাকাচ্ছেন কেন বার বার?

বিশু থতমত খেয়ে বললে, না তাকালেই ব্যাস—সব লণ্ডভণ্ড—বেটা কিছু জানে না—একেবারেই আনাড়ি—

নিরু মুখটিপে হেসে বললে, আপনার চেয়েও?

বিশু বললে, না, না, কিছু জানে না—আমিও পারি—আমিও চা করতে।—কই রে, কদ্দুর হোলো? জল ফুটলো?

নিরু যেন একটু উদ্বিগ্ন কৌতুকের সঙ্গে বললে, কিন্তু আপনার বনমালী ত কই সাড়াও দেয় না!

বিশু হতাশ কণ্ঠে বললে, সেই ত' বিপদ,—দেখি, নিজেই দেখি!—না দেখলে কিছুতেই চলবে না।

বলতে বলতে বিশু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সেইখানে গিয়ে কল্পিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ ক'রে পুনরায় বললে, হতভাগা, জল ফুটে গেছে, ষ্টোভ বন্ধ কর?—এই ব'লে নিজেই ষ্টোভ বন্ধ করলো। আবার বললে, কিচ্ছু জানে না কিচ্ছু জানে না!—এই—এই—এমনি ক'রে বন্ধ করতে হয়। বলে নিজের হাতেই জল নামাল, তারপর বলতে লাগলো, এমনি ক'রে চা দিতে হয়। নে, ঢাকা দে!—নিজেই সে ঢাকাটা দিয়ে দিল। তারপর নিজেই এগিয়ে বললে,—ওই যে, এবার কাপ ছুটো আন্—কী বল্‌লি, কাচের পেয়ালা ভেঙে ফেলিছিস? হতভাগা—আন্—ওই গেলাস ছুটো আন্—বলে ছুটো গেলাস নিজের হাতে আনলে তারপর বললে, নে ঢাল্ এবার—উঃ—হাতটা গেল পুড়ে—

সশব্দে বিশুর হাত থেকে কেট্‌লী প'ড়ে গেল,—একটা ঝন্

ঝন্ শব্দ। ঠিক এমনি সময় নিরু পিছন দিক থেকে এসে দাঁড়ালো। বললে, কি—কি হোলো? কি হোলো?—

বিশু হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, উঃ, ছ্যাঁকা লেগেছে।

নিরু খিলখিলিয়ে হেসে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়লো। পরে বললে: মিছে কথা বললে অমন ছ্যাঁকা লাগে বৈকি। কোথায় আপনার বনমালী!—যাক খুব বাহাদুরী হয়েছে, এবার সরুন দেখি?

এই ব'লে নিরু পাশের ঘরে এসে টেবিলের কাছে তির্যক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বললে, সেই থেকে আমাকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছিলেন! কোথায় আপনার বনমালী, আর কোথায় বা কী! আপনি ত ভয়ানক লোক!

চাপা হাসিতে নিরুর দেহটা দুলে দুলে উঠল।

বিশু ত'াকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, এক্ষেত্রে মিছে কথা না ব'লে আর কোনো উপায় ছিল না।

নিরু পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বললে, ভারি হাসি পাচ্ছে কিন্তু—

বিশু করুণ কণ্ঠে বললে, তা ত পাবেই—আমার হাত পুড়লো, আর আপনার মুখে হাসি!

নিরু বললে, না, সত্যি, সেজন্যে নয়। আমার জন্যে আপনাকে গোড়া থেকেই কত যে নাকাল হ'তে হলো তাই ভাবছি।

বিশু বললে, যাক্, এই কৃতজ্ঞতাটুকুই আমার পক্ষে পুরস্কার!

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে তখন অকারণ মধুর হাসি হাসছে।

দিন তিনেক পরে আবার তাদের দু'জনকে দেখতে পাওয়া গেল ময়দানের প্রান্তে কোনো একটি নিরিবিলি কেন্দ্রে। সেদিন চায়ের আসরের ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি চলছিল।

অপরাহ্ণ প্রায় সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসেছে। দূরে গঙ্গার দুই পারে এরই মধ্যে কোথাও কোথাও আলো জ্বলেছে। গাছে-পালায়, হাওয়ায় নতুন বসন্তকালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নিরু মুখ টিপে টিপে তখনও হাসছে।

বিশু বললে, হাসি আরম্ভ হলে আর থামতেই চায় না! কি হাসিই হাসেন একেবারে পাগলের হাসি।

নিরু বললে, হাসবো না? সেদিনকার কথা ভাবলেই আমার হাসি আসে। না হয় আপনার গায়ে হঠাৎ আমার পা-ই লেগে গিয়েছিল—তাই ব'লে যাবার সময় আপনি ব'লে গেলেন কিনা, পায়ে আপনার লাগেনি ত! উঃ—কী তামাসাই আপনি করতে পারেন। যখনই ভাবি, তখনই হাসি পায়। একেবারে বিনয়ের অবতার।

বিশু হেসে বললে, আচ্ছা বেশ, কী বললে আপনি খুশী হতেন? এ ছাড়া আর কি বলতে পারতুম, শুনি?

নিরু বললে, যা বলতে পারতেন, তা আপনি বলেননি!

বিশু বললে, বেশ যা হোক—একলা ট্রেণে আসছি—মাঝখানে শেকল ছেঁড়া পাগলের উৎপাত—তারপর দেখতে দেখতে হঠাৎ এক তরুণীর আবির্ভাব—কিন্তু হা হতোস্মি!—আমাকে দেখে পাগল ব'লে আঁতকে ওঠা!—সুধু এই নয়—শেষ পর্যন্ত পাগলের মতন গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে প্রমাণ করতে হোলো—আমি পাগল নই!

নিরু কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে, আপনি পাগল কি না সে কথা এখন থাক্—কই, কি যেন বলবেন বলছিলেন?

বিশু চুপ ক'রে কী যেন ভাবতে লাগল। নিরু পুনরায় বললে, আচ্ছা, আমি একটা সত্যি কথা বল্‌ব?

বিশু হেসে বললে, না—সারাদিন ঘুরে ঘুরে দুজনে ক্লান্ত—সন্ধ্যে হয়ে এলো—সত্যি-মিথ্যে এখন থাক্—

নিরু উৎসুক ভরা দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে তাকালে। বললে, তা'হলে—?

বিশু বললে, এখন সুধু দু'জনের খেয়াল আর খুশীর কথা হোক।

দু'জনে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইল। এক সময় নিরু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবার কিন্তু যেতে হবে। নৈলে দাদু কী ভাববেন!

বিশু উঠে দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, চলুন।

আর একদিন দু'জনের দেখা হেলো কলেজ থেকে বেরিয়ে। ওরা একজন আর এক জনকে খুঁজে পাবার জন্য অনেক সময়ে একটা বিশেষ পথের মোড়ে এসে দাঁড়ায়। তারপর হাসি বিনিময় ক'রে দূরে কোথায় গিয়ে এক হয়। সেদিন এসপ্লানেডের শেডের ভিতর দাঁড়িয়ে বিশু বললে, কিন্তু একটা কথা—

নিরু বললে, বলুন?

বিশু লজ্জিত কণ্ঠে বললে, না—শুনলে আবার আপনি হাসবেন!

নিরু বললে, বাজে কথা বুঝি? নিরুর চোখে দুষ্টুমী।

বিশু বললে, না, লজ্জার কথা—

নিরু বললে, অর্থাৎ—? নিরুর কণ্ঠে আগ্রহ।

বিশু বলেল, অর্থাৎ—আপত্তিজনক!

নিরু বললে, যদি অভয় দিই?

বিশু বললে, সাহস পাইনে!

নিরু বললে, তা হোক—বলুন! বলতেই হবে।

বিশু মৃদু গুঞ্জন ক'রে বললে, কিন্তু বলার সময় এখনো যে হয়নি! এখনো সন্ধ্যার তারা জাগেনি, এখনো দখিণ সাগর থেকে

বাতাস ওঠেনি, এখনো আকাশপথের পাখী তা'র বাসা খুঁজে পায়নি !' —এই ব'লে সে হুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগলো।

নিরুর উৎসুক চোখে মুখে সর্বাঙ্গে আনন্দ-আবেশের থরথর কম্পন যেন দেখা দিল।

বিশু মৃত্নস্বরে বল্‌লে, আগে চাঁদের আলো ঘন হয়ে উঠুক, তখন বল্‌বো ! চলুন এবার—

হু'জনে চলতে লাগলো মাঠের পথ ধরে। অনেকক্ষণ পরে তা'রা এলো মেমোরিয়েলের কাছে। একটা গাছের ছায়ার ধারে বেঞ্চে বসে বিশু বললে, সেদিনকার সেই কথাটা, কই বললেন না ত ?

নিরু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ? কোন্ কথা ?

বিশু হেসে বললে, সেই যে—সেদিন রাতে কি যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন ?

নিরু 'ওঃ' ব'লে হেসে উঠলো। একটু পরে সুরু করল, সে ভারি মজার দুঃস্বপ্ন !

বিশু সকৌতুকে বললে, কি রকম ?

নিরু হুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বললে, আপনার শুনে লাভ ?

বিশু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে বললে, না লাভ কিছু নেই ! দুঃস্বপ্ন দেখে আপনি কেঁদে উঠেছিলেন কি না তাই জানতে চাইছি।

নিরু বললে, যদি বলি সে-কান্নার কোনো সাক্ষী ছিল না।

বিশু হাসিমুখে বললে, ছিল বৈকি ! আর একবার মনে করুন ত ? স্বপ্নে কি কাউকেই দেখতে পান্ না ?

নিরু বললে, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পাই !

বিশু বললে, কা'কে ? একটু বলুন না ?

কটাক্ষে তাকিয়ে নিরু বললে, গান গেয়ে জানাতে পারি, সোজা ভাষায় বলা কঠিন।

অধীর আগ্রহ নিয়ে বিশু বললে, কেন?

ঠোঁট উল্‌টে নিরু বললে, বড্ড সোজাসুজি, বড্ডই পাশাপাশি! দু'জনে উচ্চকণ্ঠে হেসে বাতাসকে মুখর ক'রে তুললো।

সেদিন স্থির হয়েছিল দু'জনে যাবে কলকাতার একটু বাইরে বন্ধু-দের সঙ্গে পিক্‌নিক্‌ করতে। সেই মতো আয়োজনও হয়েছে। আবার দু'জনে ফিরবে সন্ধ্যায়। নিরু যখন সাজসজ্জা ক'রে প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময় নীচে দাদু ফুলদানিতে একটি গোলাপের তোড়া সাজাচ্ছিলেন প্রসন্ন আননে। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে নিরু নেমে এলো,—একবার ঘড়ির দিকে তাকালো—বেলা এগারোটা বাজে—তারপর আরও দ্রুতপদে সে যখন নীচের বারান্দা পেরিয়ে দাদুর ফুলসাজানোর দিকে সহাস্যে চেয়ে বেরিয়ে যাবে,—দাদু তখন তাঁর অতি-পরিচিত লঘু পদশব্দে ফিরে তাকালেন। হেসে ডাকলেন :

"সুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও!"

নিরু একগাল খুশীর হাসি হেসে কাছে এসে দাদুর হাত ধ'রে বললে, পরের লাইনটা বুঝি মনে নেই তোমার? "যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে যাও!"—কিন্তু আমি ত' ফেলিনি দাদু, তুমি আমার সব!

দাদু তামাসা ক'রে বললেন, তুই ত' ভাই মৌখিক আশ্বাস দিলি! কিন্তু এখন যে দেখছি "আমার বঁধুয়া আন্‌বাড়ী যায়, আমারই আঙ্গিনা দিয়া!"

নিরু চকচকে চোখে চেয়ে বললে, কিসে বুঝলে?

দাদু বললেন, চলনে,—বচনে,—চরণে,—ধরণে!—কি দিদি, তোদের রিহার্সাল কি আজো চলছে? আর কদ্দিন?

নিরু ও দাছ উচ্চকণ্ঠে হেসে যেন ফেটে প'ড়লো, আর তারই ওপর দিয়ে নিরু ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল।

অসীম উদ্বেগ, আকুলতা ও চঞ্চলতার সঙ্গে নিরু এসে বিশুর বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখলো, ঘরের দরজার শিকলে ও কড়ায় তালা বন্ধ। অবাক হয়ে সে থমকে গেল। এমন সময় পাশের ফ্ল্যাটের একটি চাকর এক চাঙ্গারি বাজার নিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল—নিরু সহসা তাকে প্রশ্ন করলো : আচ্ছা—

চাকরটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিরু জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটের বিশ্বনাথবাবু কোথা গেছেন বলতে পারো ?

চাকরটা বললে, হ্যাঁ, এই ত' আজ সকালে দেখলুম—

নিরু বললে, কি দেখলে বলো ত ?

দেখলুম, বাক্স বিছানা নিয়ে কোথা যেন চ'লে গেলেন।

.নিরু বললে, চলে গেছেন ? কোথায় ? জানো কিছু ?

নিরুর মুখে চোখে উদ্বেগ আর অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলে।

চাকরটা বললে, আজ্ঞে না, তা বলতে পারিনে !—এই ব'লে সে উপরে গেল। নিরু হতাশ ও শ্রান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। কিছুই সে বুঝতে পারলো না। আর কোনোদিন বিশু তাকে কথা দিয়ে এমন আচরণ প্রকাশ করেছে, এ তা'র মনেই পড়লো না।

হঠাৎ কেমন যেন একটা আঘাত খেয়ে নিরু ধীরে ধীরে পথে নেমে একদিকে চলতে লাগলো। আর কোথাও তা'র যাওয়া হোলো না—বাড়ীতেও সে গেল না। কোনো এক বান্ধবীর বাড়ীর দিকে সে মন্থর গতিতে চলতে লাগলো আনমনে।

৭

বিশু টেলিগ্রাম পেয়েছিলো সকালে। জরুরী তার, দেশে ডাক পড়েছে। নিরুকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ নিরুদের বাড়ীর সঙ্গে তা'র কোনও পরিচয় নেই। হঠাৎ একটা কথা বলার জন্য অপরিচিত সে যাবে নিরুর ওখানে, এটা তা'র কাছে খুব অসুবিধা-জনক মনে হয়েছিল। নিরুদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে সে জানে। কিন্তু না জানে নম্বর, না জানে তা'র দাদুর নাম। সুতরাং ঘণ্টাখানেক ধ'রে অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রেও সে নিরুকে সংবাদ দেবার সুবিধা করতে পারলো না।

অথচ টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ীতে রওনা হবে না, এত কল্পনার অতীত। হয়ত সেখানে অঘটন কিছু ঘটেছে, হয়ত কোন বিপদ। হয়ত বা তা'র জননীর সংবাদ পাওয়া গেছে! নানাপ্রকার তোলা-পাড়া ক'রে বিশু সকালের ট্রেণ ধ'রে সোজা দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল। ফিরে এসে নিরুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই চলবে।

দেশের বাড়ীতে এসে পৌঁছলো পরের দিন ভোরবেলা। বাড়ীতে এসে দেখলো, সবাই হাসিখুশী, সকলেই নিরাপদ। বিশু একটু ক্ষুণ্ণই হোলো। এক সময় রাগ ক'রে বৌরাণীকে বললে, বাবার অসুখ বলে মিথ্যে-মিথ্যে তোমরা টেলিগ্রাম ক'রে আমাকে আনালে! এমন করলে পড়াশুনো হয় না—সব ছেড়েছুড়ে তোমাদের নিয়ে আমাকে ব'সে থাকতে হয়!

বৌরাণী হেসে বললেন, শোন্, রাগ করিসনে আমার ওপর। অসুখ ত' ওঁর আছেই বারোমাস,—তা'র ওপর উনি হঠাৎ সেদিন নায়েব মশাইকে ডেকে চেঁচামেচি ক'রে তোর বিয়ের ঠিক করলেন—

বিশু সবিস্ময়ে বললে, বিয়ে! কি বল্‌ছ? তা'র মানে কি শুনি?

মাতাপুত্রের আলাপ চলছে, এমন সময় ওঘর থেকে যুগলবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। বৌরাণী বললেন, যতীন ঠাকুরপো, এসেছেন!

যুগলবাবু চেঁচিয়ে বলছিলেন, বুঝলে যতীন, তোমরা সব শকুনির পাল, মরবার আগেই এসেছ ছিঁড়ে খেতে! ওসব চলবে না, ও আমি পারবো না—

বিশু বললে, ঐ শোনো, ওঁর কেবল চেঁচামেচি!

বৌরাণী বললেন, ওর ওই স্বভাব! তোর সঙ্গে ব'সে চারদণ্ড উনি কথা কইবেন মনে করেছিলেন, এমন সময় এলেন যতীন ঠাকুরপো। তাই চ'টে গেলেন।

বলতে বলতে বৌরাণী পাশের ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে কি যেন দেখলেন। ভিতরে তখন দুই জ্ঞাতি ভাই আলাপ করছেন। যতীন-বাবু বললেন, আহা, আপনি শান্ত হয়ে শুনুন না, দাদা।

যুগলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, শুনবো কি? শোনবার কি আছে? তুমি ত আর আমার সহোদর ভাই নও যে, মায়া মমতা দেখাতে এসেছ! তোমরা আত্মীয় কুটুম্ব! এসেছ কেবল নিজের কাজ গোছাতে।—না, এ আমি হ'তে দেবো না, এ কিছুতেই হবে না।

উত্তেজনা অত্যন্ত বেড়ে চলেছে দেখে বিশু আর থাকতে পারলো না; এ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো পিছন থেকে। তা'কে কেউ লক্ষ্য ক'রলো না।

যতীনবাবু বললেন, কিন্তু তবু আমার কথাটা আপনাকে

শুনতেই হবে, দাদা। আপনি না হয় ছেলেটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন—কিন্তু দত্তক নেননি ত? হ্যাঁ—গরীবের ছেলে—আপনার এখানে ভাত কাপড় পেয়ে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে—বেশ ত, ওকে কিছু ধ'রে দেবেন। কিন্তু তাই ব'লে ত আর পথের ছেলেকে ধ'রে এত বড় জমিদারীটা বিলিয়ে দিতে পারেন না?

যুগলবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, বিলিয়ে? বিলিয়ে তুমি কাকে বলো? বুকের রক্ত দিয়ে আমরা যাকে মানুষ ক'রে তুললুম, তাকে তুমি কতটুকু জানো যতীন? হ্যাঁ, পথ থেকেই বিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছি, পথেরই ছেলে সে,—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু পথের নুড়ি তুলে এনে লোকে যখন মন্দিরে বসায়, তখন তা'র নাম দেয় শালগ্রাম, সে হয় নারায়ণ! তুমি তা'র কী বুঝবে? তোমরা অধার্মিক, তোমরা স্বার্থপর।

এমন সময় বিশু তাঁড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, শুনুন— আপনি শান্ত হোন—

যুগলবাবু ও যতীনবাবু এক সঙ্গে তা'র দিকে তাকালেন।

বিশু বললে, যতীনবাবু কিছু অন্যায় বলেননি। আপনারা আমার অতি দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছেন, বড় ক'রে তুলেছেন, মানুষ করেছেন! আপনাদের কাছে আমি অনেক পেয়েছি, কত যে পেয়েছি তার সীমা নেই—তারপরেও আর যদি কিছু না পাই দুঃখ জানাবো না—হাসি মুখেই চ'লে যেতে পারবো। তা ছাড়া বিষয় সম্পত্তি আমাকে কেনই বা দান করবেন,—আমি ত, সত্যিই আপনাদের কেউ নেই!

যুগলবাবু যেন ফেটে উঠলেন। বললেন, দেখলে যতীন—ওই ছাখো তুমিও যা, ও-ও তাই! এত বড় অধার্মিক যে, নিজের বাড়ীকে বলে পরের আশ্রয়? বলে, অনেক পেয়েছি? কী পেয়েছ

শুনি? কই দেখাও দেখি? স্বার্থপর—ঘোর স্বার্থপর! আমাকে জমিদারীর মধ্যে ডুবিয়ে রেখে উনি চলে যাবেন হাসিমুখে! একালের ছেলে কিনা, তাই মা-বাপের মুখের ওপর সুধু হাসতে শিখেছ! কিন্তু আমিও ব'লে রাখলুম—আমিও শাস্তি দিতে জানি! নায়েবকে সাক্ষী রেখে তোমার মতন স্বার্থপর ছেলের নামে দানপত্তর লিখে দিয়ে কাশী পালাবো—তখন তোমার ওই চাঁদমুখে কেমন হাসি ফোটে, দেখবো! অধার্মিক—সব অধার্মিক!

বিশু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, আপনাকে বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলুম না—

যুগলবাবু দুই হাত নেড়ে বললেন, বোঝাবে কি? বোঝাবুঝির আছে কি? তোমরা সবাই কাজ গোছাতে এসেছ বৈ ত' নয়!

যতীনবাবু বললেন, আমি তবে এখন উঠলুম, দাদা। কিন্তু যাবার আগে আবার ব'লে যাই, আর যাই করুন—বৌ-ঠানকে যেন পথে বসাবেন না!—বলতে বলতে যেন পরমাত্মীয়ের দুশ্চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর চলে যাবার পর বৌরাণী মুখটিপে হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন। স্বামীর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ গা, এমন সরল সাদাসিদে মানুষকে তুমি চিনলে না? শুক্‌নো মুখে ফিরিয়ে দিলে?

যুগলবাবু প্রশ্ন করলেন, কার কথা বলছ?

বৌরাণী একটু হেসে বললেন, কেন, আমার ওই যতীন ঠাকুরপো? আমার ওপর যা'র এত মমতা, তাকে দুটো মুখের মিষ্টি কথাও বললে না?

যুগলবাবু জ্বলে উঠলেন, মিষ্টিকথা? ভস্মে ঘি ঢালা! মিষ্টিকথা শুনবে কে, বড়বউ? এই দ্যাখো না তোমার বিশু। এতকাল পরে বলে কিনা এটা পরের আশ্রয়! যতীনের সামনে আমার কানটা ধ'রে জানিয়ে দিল, ও পরের ছেলে, ও একদিন হাসিমুখে

চ'লে যাবে—বড়বউ, এতকাল ধরে ও আমাদের কেউ নয়! বলতে ওর মুখে একটু বাধলো না? তুমি ঘর তুলেছ চোরাবালির ওপর— চোরাবালির ওপর!

বিশু অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললে, না না, বাবা—আমি ওকথা বলতে চাইনি! আমি আপনাকে বোঝাতে পারিনি।

যুগলবাবু এবার কতকটা শান্তভাবে বললেন, আচ্ছা বেশ, তুমি বোঝাতে পারোনি, আমিও না হয় বুঝিনি! ফুরিয়ে গেল। এবার তাহ'লে তোমার বিয়ের কথায় এসো। একটি নয়, তিন-তিনটি মেয়ে দেখে রেখেছি।

বৌরাণী হাসিমুখে বললেন, ওরে, তাব'লে তিনটি নয়, একটিকেই উনি বিয়ে করতে বলছেন।

বিশু বললে, কিন্তু মা—

বৌরাণী বললেন, কি বল্।

আমার এখন বিয়ে করা কি সম্ভব? নতমুখে বলল বিশু।

যুগলবাবু দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলেন, বললেন, অসম্ভব কেন, শুনি?

বৌরাণী বললেন, আহা, তুমি চেঁচিও না। বিশু এখন বড় হয়েছে, ওর কথাটাও শুনতে হয়।

যুগলবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, তোমাদের সুধু কথা আর কথা। কাজের কথা বাদ দিয়ে কেবল বাজে কথা।

বিশু বললে, বাবা।

কি বলো। অনুগ্রহ ক'রে বলো। ব'লে আমার মাথাটা কেনো। —যুগলবাবু ক্ষিপ্তকণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন!

একটু চুপ করে থেকে বিশু বললে, এখন আমার পক্ষে বিয়ে করা চলে না, বাবা—

চলে না! চলে না কেন? যুগলবাবু আবার চটে উঠলেন।

বৌরাণী বললেন, কেন রে?

বৌরাণীর মুখের দিকে চেয়ে বিশু বললে, তুমি ত আমার আগেকার সব কথাই জানো মা। বিয়ের কথা আমি কেমন ক'রে বলতে পারি? এমন সমস্যায় তোমরা আমাকে ফেল না। বলতে বলতে নতমস্তকে সে বেরিয়ে গেল।

যুগলবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাত পা নেড়ে বলে উঠলেন, শুনলে বড়বউ। এবার তোমার চোখ ফুটলো। মোহ ঘুচলো।

বৌরাণী বললেন, কিন্তু বিশুর কথাটাও ভাবতে হবে বৈকি।

যুগলবাবু হতাশভাবে বললেন, বেশ, তাই ভাবো, সবাই মিলে বিশুর কথাই ভাবো। কিন্তু আমার জন্যে তোমরা আর কেউ ভেবো না, বড়বউ। আমার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি—আমার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।—বলতে বলতে তিনি উঠে বেরিয়ে গেলেন।

অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে বিশু এলো বাড়ীতে—কিন্তু কোথা থেকে কী যেন বিড়ম্বনা দেখা দিল। যতীতনবাবু এলেন কাণে মন্ত্র দিতে, যুগলবাবু এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা নিয়ে মাথা গরম করেন—আর মায়ের ইচ্ছা বিয়ে করা,—এই প্রকার একটা গণ্ডগোলের ভিতরে পড়ে বিশু যেন দিশাহারা হয়ে গেল।

যুগলবাবু নিশ্চিত তা'র ওপর রাগ করেছেন সন্দেহ নেই; বৌরাণী অবশ্য অনেকটা নির্লিপ্ত,—কিন্তু এইপ্রকার অবস্থার ভিতরে যদি বিশুর প্রতি কোথাও কোনো কর্তব্যের আহ্বান থাকে, তবে সে তা সম্পাদন করবে নিশ্চয়ই। জমিদারীর দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে তাকে নিতে হবে, এই বিরাট কাছারি—এই পরিবার—সরকারি খাজনার ঝুঁকি—প্রজা-সাধারণকে সুপরিচালিত করা,—এ সমস্তই তা'র কর্তব্য। এগুলি তা'র পক্ষে প্রাথমিক কাজকর্ম।

কিন্তু তা'র বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে বেড়ানো,—মা-বাবার এ কি বাতুলতা? আড়ালে এসে বিশু নিজের মনে খুব হাসতে লাগলো। রঙ্গে রসে আনন্দে তা'র সমগ্র চিত্তাকাশে যে পরিপূর্ণতা—তা'র সংবাদ ওঁরা জানেন কতটুকু? জীবনে সে আর কোনো নারীর কল্পনা যে সে করতে পারে না, এটি যেন তা'র জানবার প্রবল বাসনা জাগতে লাগলো। কিন্তু বিশু কিছুই করলো না, কেবল একলা নিজের মনে ব'সে চুপি চুপি অনেকক্ষণ হেসে নিল।

কলেজে ছুটি নিয়ে সে আসেনি, ছুটি নেবার সময় সে পায়নি। তাছাড়া—তাছাড়া যা'র কাছে সত্যকার ছুটি নেবার তাকেও কিছু ব'লে আসতে পারেনি। তাকে না ব'লে চ'লে আসার ভয়ানক লজ্জাটা এবার যেন বিশুকে অশান্ত ও অস্থির ক'রে তুলতে লাগলো। সে স্থির করলো মাকে যা হোক ক'রে বুঝিয়ে আগামীকাল তাকে আবার কলকাতা রওনা হতেই হবে।

বিশু সেই মতো আয়োজন করতে লাগলো। নায়েবমশাইকে জানিয়ে দিল, যাবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে।

বহুদিন পরে সূর্যমুখীকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। আশা হতাশা কোনোটাই এখন তা'র আর নেই। কলের পুতুলের মতো তার জীবন। কৈলাসবাবুর শরীর ভেঙ্গে এসেছে, তার মেরুদণ্ড—একটু অবনত হয়েছে, সূর্যমুখীর কপালের দুইদিকের চুলে এসেছে ধূসরতা, মুখে অস্পষ্ট বলি রেখা, ঘরের ভিতরে চারদিকে জীর্ণতা, ধুলো জমেছে ফাইলগুলোয়। কৈলাসবাবু খুক খুক করে কাশছিলেন, এমন সময় সূর্যমুখী ঢুকলো। মুখে চোখে যেন তার নৈরাশ্যের অখণ্ড অবসন্নতা—

কৈলাসবাবু বললেন, আবার তুই কব্‌রেজি ওষুধ এনেছিস, মা?

সূর্যমুখী বললে, ওষুধ না খেলে আপনার কাশি যে কমবে না, বাবা?

কৈলাসবাবু বললেন, ও বুঝেছি, ছেলেটাকে খুঁজে না দিলে তুই মরতে দিবিনে কেমন?

সূর্যমুখী বললে, বাবা।—কি যেন বলতে গিয়ে সূর্যমুখী চুপ করে গেল।

কৈলাসবাবু বললেন, কি বল্?

সূর্যমুখী বললে, আপনি কি এখনও আশা রাখেন?

কৈলাসবাবু সহসা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, নিশ্চয়! জলজ্যান্ত ছেলে তোর যাবে কোথা? দাঁড়া শরীরটা সারুক, আবার খুঁজবো—তুই এক কাজ কর দেখি? ফাইলগুলো দেখ্, পুরানো চিঠিগুলো বার কর।

সূর্য্যমুখী বললে, বাবা!—আপনি আর কত ছুটোছুটি করবেন? আপনার সব চেষ্টাই যে মিথ্যে হ'তে চললো।

কৈলাসবাবু বললেন, মিথ্যে! ছেলে যদি' না পাই তাহ'লে সবই মিথ্যে—বাবা বিশ্বনাথও মিথ্যে!

এমন সময় বাইরে একদল ছেলেমেয়ের কলরব শোনা গেল :—

"চাঁদ আকাশে দোলে মা ষষ্ঠীর কোলে—
কাছে আসে যে, মিষ্টি পাবে সে।"

কৈলাসবাবু বললেন, সেই ক্ষুদে রাক্ষস ব্যাটারা আবার এসেছে বুঝি? একটা ছেলের বদলে তুই একপাল ছেলে জোগাড় করেছিস, যা—মা—যা—ব্যাটাদের বিদেয় করগে—

সূর্যমুখী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কৈলাসবাবু আপন মনেই বললেন, এসেছিলুম নিশ্চিন্তে কাশীবাস করতে,—যত—সব—বলতে বলতে তিনি খক খক ক'রে কাশতে লাগলেন। শেষ বয়সে

এই অসুখটা তাঁর ধরেছে। আজকাল প্রায়ই জ্বর হয়, প্রায়ই উপবাসে কাটে।

সূর্যমুখী বাইরে এসে দাঁড়াল। অপর একটি মহিলাও এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বহুকাল থেকে কাশীতে বাস করছেন, নাম তাঁর রাজলক্ষ্মী। সূর্যমুখীকে দেখে তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরেছে তোমাকে, আজ বুঝি ষষ্ঠী?

সূর্যমুখী বললে, হ্যাঁ, দিদি—

বেশ—বেশ—এরাই তোমার ছেলে, ভাই, চেয়ে ছাখো—এদের মধ্যেই তোমার মাণিককে তুমি খুঁজে পাবে!

সূর্যমুখীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খাবারের থালাগুলি এনে সে ছেলেমেয়েদের সকলকে বিতরণ করতে থাকে। ছেলেমেয়েরা শ্লোক আউড়ে চেঁচায়,—

“চাঁদ আকাশে দোলে মা ষষ্ঠীর কোলে
কাছে আসে যে, মিষ্টি পাবে সে।”

সূর্যমুখী এবং সেই মহিলাটি শান্ত স্নেহের হাসি হাসতে থাকেন। ওঘর থেকে কেবল কৈলাসবাবুর হাঁপানি-কাশির আওয়াজটা এখান থেকে শোনা যায়।

৮

কলকাতায় ফিরে বেশ কিছুদিন ধ'রে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন ক'রে তবে বিশু নিরুর কাছে খবর পাঠাতে সমর্থ হোলো।

একটা গভীর লজ্জা যেন তা'কে ঘিরে রয়েছে—নিরুর কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে কেমন ক'রে? কেমন ক'রে সে বলবে যে, মা আর বাবা তা'র জন্য পাত্রী দেখে তা'কে খবর পাঠিয়ে দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন? সে নিজের ইচ্ছায় যায়নি, বিয়ে করার ইচ্ছে তার নেই, আর কোনো মেয়েকেই জীবনে সে কল্পনা করতে পারে না! এসব কথা নিরুকে সে বোঝাবে কেমন ক'রে? নিরু তা'র কথা বিশ্বাস করবেই বা কেন?

খবর পেয়েই নিরু এলো তা'র বাসায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতেই বিশু তাকে অভ্যর্থনা ক'রে হাসিমুখে বললে, আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

নিরু সহাস্যে বললে, পেয়েছিলুম, কিন্তু তা'তে মনের কথা পাইনি! আপনার বাড়ীর খবর কি?

ভালো।—ব'লে বিশু রক্তিম মুখ নত ক'রে রইলো।

নিরু বললে, মহাকবি কালিদাসের আমলে পোষ্ট অফিস ছিল না, তাই তিনি মেঘের চর পাঠিয়ে খবর জানাতেন। আপনার কি সে বুদ্ধিও হয়নি?

বিশু হাসি মুখে বললে, মহাকবি একটা সুবিধা পেয়েছিলেন, সেটা বর্ষাকাল অনেক মেঘ ছিল। আমি যেদিন গেলুম, সেদিন রোদ্দুরে কাঠ ফাটছিল! তাছাড়া যক্ষের অবস্থা ঘটলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হোতো বৈকি!

দু'জনেই উচ্চ হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললো।

আলাপটা পুনরায় সহজ আনন্দের মধ্যে এসে পৌঁছবার পর বিশু বললে, বাস্তবিক, খবর না দিয়ে চ'লে যাওয়া ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো উপায়ই আর ছিল না। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। তারপর? এসে যখন দেখলেন তালাবন্ধ, কি মনে হোলো—?

নিরু মুখে চোখে কৃত্রিম ঔদাসীন্য এনে বললে, সে আর কি বলব, দশোদিশি একেবারে অন্ধকার !

বিশু হাসিমুখে বললে, বটে ! তাহলে বলুন, রাই উন্মাদিনী হলেন ?

নিরু বললে, তা হলেন বৈকি। তবে ললিতা বিশাখা সঙ্গে ত কেউ ছিল না যে, সাক্ষী করবো !

বিশু হেসে বললে, সাক্ষী থাকলে কী করতেন ?

নিরু বললে, করবার বিশেষ কিছু ছিল না ! তবে সখীকে ডেকে বলতুম, সখিরে, কৃষ্ণ বিনে কিছু আর ভাল লাগে না—এই সাজ সজ্জা বসন ভূষণ—এদের ভার আর বইতে পারিনে—আমাকে তোরা নতুন করে সাজিয়ে দে !

বিশু মুখ টিপে হেসে বললে, বটে উদ্দেশ্য ?

নিরু বললে, উদ্দেশ্য অতি মহৎ ! গেরুয়া বসন অঙ্গে তুলে নেবো শঙ্খের কুণ্ডল পরি !

বিশু হাসিমুখে বললে, ওরে বাবা, অতঃপর ?

নিরু বললে, অতঃপর, যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি।

বিশু বললে, বলেন কি ! কান্নাকাটিও করেছিলেন ?—

নিরু ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললে, ওমা, তা আর করিনি ! একেবারে ঝরঝরিয়ে ! বৃন্দাবন থেকে মথুরা—জল দাঁড়িয়ে গেল !

এমন সময় বাইরে সহসা কড়ানাড়ার শব্দ হোলো। দু'জনে চমকে উঠলো। বাইরে থেকে গলার সাড়া এলো, ছোটবাবু ? ছোটবাবু আছ নাকি ?

বিশু নিরুর দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বললে, এই রে নায়েব-মশায়ের গলা !

নিরু সভয়ে বললে, কিন্তু আমাকে এখানে দেখলে—কি ভাববে ?

হ্যাঁ, কিছু মনে করতে পারে!—একটু,—একটু ওঘরে গিয়ে লুকোন ত?

নিরু দৌড়ে গিয়ে পর্দাটা টেনে আত্মগোপন করলো!

ছোটবাবু!

কে?—ও, এই যে নায়েবমশাই! আসুন, খবর কি?

নায়েবমশাই ভিতরে এসে ঢুকলেন। বললেন, যাক্ অনেক কষ্টে ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি!—তা খবর আর কি, ছোটবাবু! কর্তামশাই ত সপরিবারে সন্নিসী হলেন। তোমার ওপর রাগ ক'রে একেবারে দেশত্যাগী—

বিশু সবিস্ময়ে বললে, কোথায় গেছেন?

নায়েবমশাই মুখের একটা শব্দ ক'রে বললেন, বুঝতেই পাচ্ছ, সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী! আমার হয়েছে যত জ্বালা!

বিশু অবাক্ হয়ে বললে, বাবা কাশী গেছেন? আপনি তাহ'লে—?

নায়েবমশাই বললেন, হ্যাঁ,—আমার অবস্থা এখন ঠিক ফুটবলের মতন। একবার ঠিকরে গেলুম কাশীতে, সেখান থেকে ঠিক্‌রে এখানে—এখান থেকে ঠিক্‌রে ওখানে। তুমি আর যাই করো ছোটবাবু, মাথাপাগলা জমিদারের চাকরি যেন কখনো করো না—তা বেশ তোমার এই ঘরটি ছোটবাবু—দক্ষিণ খোলা—ওঘরটিতে বুঝি রান্নাবান্না হয়?

নায়েবমশাই এগিয়ে গিয়ে ওঘরে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করতেই বিশু সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অত্যন্ত অস্থিরভাবে সে বললে, না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—রান্না হয়—এখন কিছুই নেই ওঘরে—মানে,—আপনি এদিকে আসুন—বেশ হাওয়া—ওই—ওই দেখুন—এরোপ্লেন উড়ছে—তা—তা মা'র শরীর এখন কেমন?

নায়েবমশাই হেসে উঠলেন। বললেন, ওই নাও, আসল কথাটাই ভুল—বাষট্টির আগেই এলো বাহাত্তরে—হ্যাঁ—বৌরাণীমার কথা! ভালোই আছেন; তা'র ভালো আর মন্দ! ওই একরকম চলছে! মাথাপাগলা স্বামীকে নিয়ে আমারই মতন তাঁর দশা। হ্যাঁ কাজের কথাটা বলি। রাণীমা তিনিই ত' আমাকে ব'লে দিলেন চুপি চুপি—আমিও—চুপি চুপি এসে পড়লুম।

বিশু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলো, কি বলুন ত?

নায়েবমশাই যেন উৎকর্ণভাবে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, এই বেলা কেউ কোথাও নেই—কথাটা চুপি চুপিই বলি—!

বিশু বললে, হ্যাঁ, বলুন?

নায়েবমশাই বললেন, তুমিই বা চুপ ক'রে ব'সে কেন ছোটবাবু? এতে লুকোবার আছে কি। গা ঢাকা দিয়ে তুমিও চুপি চুপি দু'চার দিনের জন্যে যাও না কেন?

বিশু বললে, কোথায়? কোথায় যাবো?

নায়েবমশাই নিজের মুখে আঙুল দিয়ে বললেন, চুপ কেউ না শোনে, দেয়ালেরও কান আছে। কাশী যেতে বলছি। কিচ্ছুটি করতে হবে না—চুপি চুপি গিয়ে সোজা সামনে দাঁড়াও! সব রাগ জল হয়ে যাবে? তুমিও ত' জানো ছোটবাবু, খড়ের আগুন—এই জ্বলে—এই নেবে!

বিশু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ—আচ্ছা, আচ্ছা যাবো—কিছুদিনের মধ্যেই যাবো। মা'কে আপনি বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু আপনি এখন এলেন—এমন সময়ে—আপনাকে কোথায়—মানে, আপনার খাওয়া-দাওয়া—থাকা—

নায়েবমশাই হাত নেড়ে বললেন, না না, ও তুমি কিছু ভেবো না—ডান হাতের ব্যাপার একেবারে কাশী গিয়েই হবে।—এদের

আমি বিশ্বাস করিনে, বুঝলে, এক তিলও নয়—তুমিও কোয়ো না ছোটবাবু।

বিশু বললে, কাদের বিশ্বাস করেন না ?

নায়েবমশাই বললেন, ওই যারা ট্রেণ চালায়! এমন মাথা পাগলা আর দেখিনি! কখন্ ছাড়ে, কখন্ ধরে—কখন্ চলে, সবই ধোঁয়া! —যাই, গাড়ীতে উঠে এইবেলা চুপি চুপি ব'সে থাকিগে! রাতেই ছাড়ুক আর দিনেই ছাড়ুক—বাছাধন যে আমাকে ফেলে যাবেন, সেটি আর হ'তে দেবো না।—যাই—পালাই চুপি চুপি! তাহলে—তাহলে চুপি চুপি তুমি একবার যেয়ো ছোটবাবু—এই কথাই রইলো!

বলতে বলতে নায়েব মশাই দু'জনকে ভয়ানক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ধীরেসুস্থে বিদায় নিলেন। নায়েবের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার পর বিশু হৈ চৈ ক'রে যখন হেসে উঠলো সেই সময় নিরু এলো আড়াল থেকে বেরিয়ে। এসেই সে ভীষণভাবে অভিনয় আরম্ভ ক'রে দিল। কোলাহল কলরব ক'রে সে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো,—না, হ্যাঁ—না, এদিকে আসুন—বেশ হাওয়া—ওদিকে যায় না, ওদিকে যেতে নেই, দেখুন—ওই এরোপ্লেন উড়ছে....উঃ লোককে আপনি কি ধোঁকাই দেন—। কী ভাগ্যে আপনার নায়েবমশাই চুপি চুপি পর্দাটা সরিয়ে দেখননি—তাহলে এই বনমালীকে, মানে আমাকে—ঠিকই দেখতে পেতেন!—খুব হয়েছে, এখন চলুন দেখি বাইরে? আবার দেরী করলে কোন্ ভগ্নদূত যে এসে পড়বে তা জানিনে। চলুন, শিগগির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

পথে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তা'রা অনেকদূর এসে পড়লো। এক সময় হাসিমুখে নিরু বললে, একটা কথা মনে পড়েছে—

বিশু চলতে চলতে বললে, কি বলুন ত ?

নিরু বললে, সেই যে সেই এক দিনের সন্ধ্যা—কী মধুর ছিল সেদিন—

বিশু বললে, আজকের সন্ধ্যাও ত' তাই—

নিরু বললে, তা হ'তে পারে কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যায় একজনের মন কান্নায় ভ'রে উঠেছিল,—তা আপনি কল্পনা করতে পারেন ?

বিশু সবিস্ময় কৌতুকের সঙ্গে বললে, কার কথা বলছেন ?

নিরু ব্যথিতকণ্ঠে সবিনয়ে বললে, একটি মেয়ের গল্প। সেই সন্ধ্যায় একটি ছেলের সঙ্গে তা'র দেখা হবে—তুজনে মিলে যাবে কোথাও—এই ছিল কথা। মেয়েটি আসছে—অধীর হয়ে আসছে—পায়ে পায়ে তার কী আগ্রহ, মনে মনে কী স্বপ্ন—চোখে মুখে কী বিহ্বলতা—কী নিবিড় অনুরাগ—কিন্তু তা'র সবই মিথ্যে হয়ে গেল সেদিন!

বিশু সবটা বুঝতে পারলো এবার। সেও বললে, এবারে ধরুন, আমি যদি বলি, সেই ছেলেটিও আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সেও মনে প্রাণে—

নিরু কম্পিতকণ্ঠে বললে, একি সত্যি ?

বিশু বললে, সত্যি!—ছেলেটিকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আমি জানি মেয়েটির জন্যে সেও অধীর হয়ে বসেছিল—সে আসবে, সে আসছে, সে এসে পড়লো, সে এলো বুঝি—

নিরু প্রশ্ন করল, তবে কেন দু'জনের দেখা হোলো না ?

বিশু বললে, ভাগ্য দু'জনকেই পরিহাস করেছিল! কিন্তু সেদিন দেখা হয়নি ব'লেই ত' আজকের সন্ধ্যা এমন অপরূপ! কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যা আবার ফিরে এসেছে, আজ দু'জনে দেখা হয়েছে—আজ একটি মন শুনতে চায় আর একটি মনের কথা।

নিরু আবেগ ভরা কণ্ঠে বললে, এতদিনেও কি সেই মন আরেকটি মনের কথা শোনেনি ?

বিশু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর কেমন যেন স্বপ্নালু চক্ষে চেয়ে বললে, তবে দু'জনের সেই মন আজ এক হয়ে যাক্! আমরা একমনে গ'ড়ে তুলি আমাদের স্বপ্নলোক—সেখানে চাঁদের আলো চিরদিন জেগে থাকুক, সেখানকার আকাশ চিরবসন্তে রঙীন হয়ে যাক্—সেখানকার জগৎ নন্দনকানন হয়ে উঠুক—

নিরু ফেনিলকণ্ঠে বললে, আর তার মাঝখানে থাকবে আমাদের একখানি পর্ণ কুটীর—কেমন? মাধবী লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা আমাদের অঙ্গন, কুটীরের কোল ব'য়ে যায় ছোট নদীটির ধারা—

বিশু বললে, প্রভাতী পাখীর গান শুনে যেন আমাদের ঘুম ভাঙে—

নিরু জুগিয়ে দিল, কনকচাঁপার গন্ধে যেন শিউরে উঠি—

বিশু বললে, তারপর দিন যখন শেষ হবে—অন্ধকারে ছড়াবে মায়া—আমাদের প্রাণের প্রলাপ নিয়ে আকাশে জেগে উঠবে তারা—

নিরু উদ্দীপ্ত মধুর কণ্ঠে বললে, নদীর কল্লোল শুনবো কান পেতে—বাগানের একান্তে ব'সে নিরু মোহমুগ্ধ কণ্ঠে গান ধ'রে দিল। আকাশে তখন সন্ধ্যাতারকার দল ঘনিয়ে এসেছে। বসন্ত বাতাস ওদের মুখে চোখে আবেশ-বিহ্বলতা জাগিয়ে দিয়ে চলেছে।

বিশু ধীরে ধীরে নিরুর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে বললে, এর চেয়ে আমার বেশী পাবার আর কিছু নেই, নিরু!

গান থামিয়ে জলভরাচোখে মুখ তুলে নিরু বললে, আমি জানি আমি কত সামান্য! আমি জানি, তোমার জীবনে যেন জোর ক'রে আমি এসেছি।

বিশু বললে, একথা মিথ্যে, এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই।

নিরু নতমুখে চুপ ক'রে রইলো।

একসময় বিশু বললে, চলো আজ তোমার বাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দেবো।

নিরু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, চলো—প্রায় আটটা বাজে।

৯

নায়েবমশাই কাশী-ষ্টেশনে পৌঁছে হস্তদন্ত হয়ে বাসার দিকে চললেন। এক্কাগাড়ী একবার উল্টে গিয়েছিল,—টাঙা গাড়ী তাঁকে নিয়ে একবার খানায় পড়েছিল,—সুতরাং সেইভয়ে তিনি একখানা সইকেল-রিক্স নিয়ে সোজা দশাশ্বমেধের পথে চললেন। মাঝপথে মিসরি-পুক্‌রায়ের দিকে বাঁক নিলেন। তারপর একটা গলির ভিতর ঢুকে তাঁদের বাসা পাওয়া গেল। তিনি গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে তাড়াতাড়ি অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকলেন।

যুগলবাবু কয়েকদিন থেকে কী যেন একটা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তারেরা ভয় পেয়েছেন। তাঁর অবস্থা তেমন ভালো নয়। হৃদযন্ত্রের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ।

নায়েবমশাই ভিতরে আসতেই বৌরাণী ছুটে এলেন। উদ্বিগ্ন ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, নায়েবমশাই, তাকে আনতে পারলেন না?

নায়েবমশাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আসবে নিশ্চয়ই আসবে মা। কি যেন কাজ আছে, সেরেই চ'লে আসবে।

বৌরাণী ব্যাকুল হয়ে বললেন, কিন্তু ওঁর অবস্থা ভালো দেখছিনে নায়েবমশাই—আমি বোধ হয় আর রাখতে পারলুম না!—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এলো।

এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এলো ভগ্নকণ্ঠে, বড়বউ—!

বৌরাণী তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন। তারপর স্বামীর মাথার নিকট এসে বললেন, কেন, কী বলছ?

যুগলবাবু বললেন, কই না, কিছু না!—আচ্ছা বড়বউ? তুমি যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

বৌরাণী বললেন, হ্যাঁ, উনি নায়েবমশাই—দেখতে পারছ না?

যুগলবাবু বললেন, ও, নায়েব! আমি যেন কা'র গলা শুনতে পেলুম! মনে করলুম বুঝি আর কেউ!

বৌরাণীর চোখ আর বাধা মানলো না, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

নায়েবমশাই পিছনে পিছনে এসেছিলেন। এইবার বৌরাণীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সে আসবে কর্তামশাই শিগগিরই আসবে!

যুগলবাবু বললেন, ও, আসবে? এখনো আসেনি!—আচ্ছা বড়বউ তুমি কি দেখতে পাও না তা'র আসার সময় হয়েছে! তোমরা কি দেখতে পাও না নায়েব, আমি দু'হাত বাড়িয়ে বসে আছি শুধু তা'রই জন্যে? কখন্ আসবে?

বৌরাণী বললেন, তুমি একটু চুপ করো, সে শিগগিরই আসবে!

যুগলবাবু কম্পিতকণ্ঠে বললেন, ওদিকে বেলা ফুরিয়ে এলো, বড়বউ—অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—আমাকে জেনে যেতে হবে—

শেষকালের আলোটুকু ফুরোবার আগে আমাকে জেনে যেতেই হবে—আমার বিশু—আমারই বিশু—পথের ছেলে সে নয়!

নায়েবমশায়ের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো। কিন্তু যুগলবাবু তখনই একবার উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন। হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝতে পেরেছি!—বড়বউ, আমার চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে!—হা হা হা!

বড়বউ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, ওগো, চুপ করো তুমি, আবার সেই ব্যথাটা বাড়বে!

যুগলবাবু হাসিমুখে বলবেন, না বড়বউ, আর কোনো ব্যথা নেই! —এবার বুঝতে পেরেছি কেন সে আসতে পারছে না! কেন জানো? সে যে আমার ক্ষমা পেতে চায়!—বলতে বলতে তিনি পুনরায় হাসতে লাগলেন।

সহসা একবার ধড়ফড়িয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, না —না, কিছুতেই না—ক্ষমা আমি করবো না!—কি বলো নায়েব? দোষ কিছু করেনি, অথচ ক্ষমা করবো? লোকে হাসবে যে!—না না না, লোক-হাসাতে আমি পারবো না! দাও, দাও নায়েব—তাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দাও—পষ্ট ব'লে দাও, যার দোষ নেই, তা'র ক্ষমাও নেই! দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও?

নায়েবমশাই মাথা হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

বৌরাণীও বেরিয়ে এলেন পিছনে পিছনে। তারপর ডাকলেন, নায়েবমশাই—

নায়েবমশাই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কি মা?

বৌরাণী বললেন, অবস্থা দেখলেন ত? এখুনি বিশুকে একটা তা'র ক'রে দিন—

নিজের রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

নায়েবমশাই বললেন, বেশ, তাই দিচ্ছি মা—এখুনি দিচ্ছি—বলতে বলতে তিনি একপ্রকার ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আজ দিন আষ্টেক হোলো বুড়ো কৈলাসবাবু মারা গেছেন। তাঁর সংস্থান তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। তবে তাঁর অন্তিমকালে সমস্ত ঘর ঝেঁটিয়ে ফাইলপত্র জড়ো ক'রে সূর্যমুখী পুরনো কাগজওলার কাছে কিছু পেয়েছিল। তাছাড়া ঘরে আসবাবপত্রও সামান্য কিছু ছিল। সেইগুলি ছুটোছুটি ক'রে বিক্রী ক'রে সূর্যমুখী ডাক্তার ডেকে কৈলাশবাবুকে ঔষধ খাইয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল পাওয়া যায়নি। হারানো সন্তানকে খুঁজে বা'র করার সমস্ত কল্পনা মহাকালের ভাণ্ডারে অসমাপ্ত রেখে কৈলাসবাবুকে একদিন বিদায় নিতে হলো।

সূর্যমুখী নতুন ক'রে পথে বসলো না—কারণ পথে সে ব'সেই ছিল। সে কাঁদলো না, কারণ অশ্রুর সমুদ্রেই তা'র জীবনের ভেলাটা ভাসছে আজ পনেরো ষোল বছর। নিজের জীবনধারণের কথাটা ভাবলো না, কারণ সেটা বাবা বিশ্বনাথের হাতে! কিন্তু সে কেবল পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইলো!

এমন সময় একদিন সেই রাজলক্ষ্মী নাম্নী কাশীবাসিনী মহিলাটি এসে তা'র কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, এতে মানুষের হাত নেই ভাই। তোমার ছেলেকে তিনি খুঁজে পেলেন না, কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ তাঁকে খুঁজে নিয়ে পায়ে ঠাঁই দিলেন।

সূর্যমুখী বললে, দিদি, আমার আর কোনো—

তা'র গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এলো।

রাজলক্ষ্মী বললেন, উঠে দাঁড়াও দিদি, ভয় কি? যাঁর দয়াতে

একদিন তুমি কাকাবাবুকে পেয়েছিলে, তাঁর দয়ায় আবার তোমার একটা আশ্রয় জুটে যাবে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

সূর্যমুখী মুখ তুলে বললে, কোথায় দিদি?

রাজলক্ষ্মী বললে, ওমা, কত জায়গা আছে, এ যে কাশী! এসো তুমি। আর দেরী করো না।

ঘরে কিছু নেই,—নেবার মতো কোনো জিনিসেরও অভাব। সূর্যমুখী ঘরের শিকলটা লাগিয়ে গায়ে চাদরখানা জড়িয়ে পথে এসে নামলো। রাজলক্ষ্মী চললেন তা'র পাশে পাশে।

গণেশ মহাল্লার পথে পেরিয়ে কালীতলা দক্ষিণে রেখে দশাশ্বমেধ ছেড়ে তারা চললো উত্তর পশ্চিমের পথে গোধুলিয়ার রাস্তায়—সেখান থেকে মিস্‌রিপুকরায়—একটা গলিপথে—।

একজন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ঢুকে ভিতরে দোতলায় উঠে রাজলক্ষ্মী ডাকলেন,—বৌমা—বৌমা শুন্‌ছ?

যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি বৌরাণী। রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করলেন, আজ কর্তামশাই কেমন আছেন?

বৌরাণীর চক্ষে জল এলো। তারপর কম্পিতস্বরে বললেন, ভালো নেই!

রাজলক্ষ্মী বললেন, তোমার ছেলে আজো এসে পৌঁছন নি, বৌমা?

বৌরাণী বললেন, না—

অতঃপর রাজলক্ষ্মী সূর্যমুখীকে দেখিয়ে বললেন, এই যে, এঁর কথাই তোমাকে ব'লেছিলুম, বৌমা। ইনি তোমার কাছে থাকলে তোমার অনেক উপকার হবে! ইনি গেরস্থ ভদ্র ঘরের মেয়ে। তবে কিনা দুরবস্থায় প'ড়ে—

বৌরাণী সূর্যমুখীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন! আমার বড় বিপদ—আপনি আমার কাছে থাকবেন! এর বেশী আর কিছু এখন বলতে পাচ্ছিনে, দিদি!

সূর্যমুখী বললেন, আর কিছু বলতেও হবে না, বোন। আপনার বিপদ—আমাদের সকলের বিপদ!

এমন সময় ওঘর থেকে আর্তভগ্ন-কণ্ঠে কে যেন কেঁদে উঠলো,—বড়বউ ?

বৌরাণী দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

এঘরে ছুটে এসে তিনি একেবারে স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বলিলেন, কি—কি বলছ ?

যুগলবাবু বললেন, রাত এখনও শেষ হয়নি, বড়বউ ?

বৌরাণী বললেন, ওগো এখনও সন্ধ্যা হয়নি যে।

যুগলবাবু বললেন, ও, সন্ধ্যা হয়নি ? তবে সব জানলা খুলে দাও, বড়বউ! চারদিক থেকে আলো এসে পড়ুক, বড়বউ—আলো চাই—আলো চাই।

বৌরাণী তাড়াতাড়ি জানালাগুলো খুলে দিলেন। ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়লো। সেই আলোয় যেন আনন্দে বিহ্বল হয়ে যুগলবাবু ডাকলেন, বড়বউ ?

বৌরাণী বললেন, কেন ?

শুনতে পাচ্ছ ?

কি ? কি শুনবো গো ?

যুগলবাবু বললেন, কান্না।

বৌরাণী বললেন, কান্না! কা'র ?

যুগলবাবু বললেন, জানিনে! কিন্তু অনেক নীচে থেকে যেন কান্না উঠে আসছে! বড়বউ, বলো ত, অমন ক'রে কাঁদে কেন ?

জানালার পাশে সূর্যমুখী দাঁড়িয়ে সকরুণ চোখে রোগীর দিকে তাকালো।

বৌরাণী স্বামীর গলা জড়িয়ে বললেন, ওগো, অমন ক'রো না তুমি,—আমি থাকতে পারিনে!

যুগলবাবু বললেন, কিন্তু ওই কান্নাটা আমি কেমন ক'রে চাপা দেবো, বড়বউ ?

বৌরাণী বললেন, কই, এখানে ত' কেউ কাঁদেনি !

যুগলবাবু বললেন, কাঁদছে, কাঁদছে—তুমি শুনতে পাচ্ছ না বড়বউ—বুক ফাটা কান্না কাঁদছে ! যতদিন ফিরে না পাবে, ও কান্না কিছুতেই থামবে না ! ও-কান্না উঠছে অনেক নীচের থেকে। শুনছ না ? কবে ও-কান্না থামবে বলতে পারো, বড়বউ ?

ওধারে সূর্যমুখীর চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে জল গড়িয়ে এলো।

বৌরাণী বললেন, ওগো, বিশুকে তার করা হয়েছে, সে শিগ্‌গিরই আসছে ! এই ব'লে স্বামীকে তিনি এক দাগ ঔষধ খাওয়ালেন।

যুগলবাবু একটু থেমে বললেন, বড়বউ ! বড়বউ—

বৌরাণী বললেন, ওগো, অত অস্থির হয়ো না তুমি !

যুগলবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, একখানা মই—একখানা মই দিতে পারো ?

বৌরাণী বললেন, মই ! কি বলছ ?

তিনি যেন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন।

যুগলবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—একখানা মই !

বিকারের ঘোরে যুগলবাবু সহসা উঠে বসলেন। তিনি যেন একটা অন্ধ গুহাগহ্বর থেকে প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন। পুনরায় বললেন, মই, মই একখানা ! কেন ওই কান্নাটার তলায় তলিয়ে যাবো ? কেন সবাই নীচের দিকে আমাকে টেনে রাখছে ? আমাকে উঠতে দাও, মইখানা দাও, মইখানা না দাও বাঁধন কেটে পালাতে দাও বড়বউ,—তুমি আমার হাত ধ'রো।

বৌরাণীর চোখে জল এলো।—তিনি আর্তকণ্ঠে বললেন, ওগো, ওগো—এবার তুমি চুপ করো, তুমি চুপ করো। তার পেলেই তোমার বিশু ছুটে আসবে।

সূর্যমুখী আর স্থির থাকতে পারলো না, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অন্তিম শয্যাশায়ী যুগলবাবুর পায়ের কাছে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কলকাতায় বিশু নিরুদের বাড়ীতে হন্তদন্ত হ'য়ে এসে প্রবেশ করলো। প্রথমেই বাইরের ঘরে পাওয়া গেল একজন পক্ককেশ বৃদ্ধকে। সঙ্কোচ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে বিশু বললে, ক্ষমা করবেন,—আপনাকে একটু বিরক্ত করবো।

দাদু হাসিমুখে তাকালেন তা'র প্রতি। বললেন, বেশ—বিরক্তই হই—বলো ?

বিশু ব্যস্ত উদ্বিগ্নভাবে বললে, নিরুপমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলুম—বিশেষ দরকার ছিল—

দাদু তা'র আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বললেন, তুমি কে ?

বিশু একটু আড়ষ্টভাবে বললে, আমাকে বোধ হয় আপনি চিনবেন না !

দাদু বললেন, বটে ! যদি বলি চিনি ? সাংঘাতিক রকম চিনি ?

বিশু শান্তভাবে বললে, আপনার সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না।

দাদু বললেন, কে বললে ? পরিচয়টা কত ঘনিষ্ঠ তা কি তুমি জানো ?

বিশু তাড়াতাড়ি দাদুর পায়ে প্রণাম করলো—

দাদু তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

বিশু বললে, আমাকে আজকেই কাশী যেতে হচ্ছে—সেইজন্যে—

এমন সময় নিরু তরতর ক'রে নেমে এসে এ'ঘরে ঢুকলো। বিশুকে দেখে সহসা হতবিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করলো, আপনিহঠাৎ।—

বিশু বললে, বাবার খুব অসুখ—এই টেলিগ্রাম—আজই আমাকে যেতে হবে—পাঁচটার গাড়ী—

নিরু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। বললে, টিকিট করা হয়েছ ?

বিশু বললে, না।

দাঁড়ান,—বলে নিরু দ্রুতপদে বাইরে এলো। এসে ডাকলো, কার্তিক—কার্তিক—

ওধার থেকে কার্তিক সাড়া দিয়ে বললে, আজ্ঞে, কি বলছেন ?

নিরু বললে, তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে যাও—একখানা কাশীর টিকিট কিনে আনো। সরকার মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও। একটুও দেরি করো না।

কার্তিক গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর নিরু দ্রুতপদে এ-ঘরে এলো। তারপর বিশুকে বললে, আপনার আর দাঁড়ান চলবে না—সাড়ে তিনটে বাজে। যা হোক ক'রে সুটকেসটা গুছিয়ে নিনগে—আমি এখুনি টিকিট নিয়ে যাচ্ছি।—

দাদু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহ'লে দিদি, ওকে কিছু খাইয়ে দে—?

বিশু বললে, কিন্তু—আমার যে আর সময় নেই!

নিরু বললে, তবে থাক্—আপনি বেরিয়ে পড়ুন—আমি ঠিক সময় যাচ্ছি—

বিশু দাদুর কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুত পথে বেরিয়ে পড়লো। ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন বাসার কাছে এসেছে, দেখতে পেল বিপরীত দিক থেকে আসছে একজন টেলিগ্রাফ পিওন। বিশু গেটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিওন এসে সাইকেল রাখলো গ্যাস পোষ্টে হেলান দিয়ে। তারপর পকেট থেকে

টেলিগ্রাম বার ক'রে বিশুর হাতে দিল। টেলিগ্রামখানা খুলে বিশু ছিঁড়তে যাবে, সেই মুহূর্তে গ্যাস পোষ্টের ধার থেকে লাল রংয়ের সাইকেলখানা সশব্দে ঝড় ঝড় ক'রে পথের ধারে আছাড় খেয়ে পড়লো। যেন ওটা একটা অমঙ্গলের চিহ্ন!

টেলিগ্রামখানা প'ড়ে বিশু কাঠের মতো স্তব্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেল।

কার্তিক ফেরবার পর টিকিটখানা নিয়ে নিরু বেরুতে যাবে, এমন সময় ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধ'রে নিরু বললে, কে? হ্যাঁ—আমি—কি বল্লেন?—আপনার বাবা মারা গেছেন?

টেলিফোনে জবাব এলো, হ্যাঁ নিরু, আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয় আজ ভেঙে পড়লো!

নিরু নিশ্বাস ফেললো। তারপর অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হোলো না, সেই কথাই বার বার মনে হ'চ্ছে!

ওপাশ থেকে বিশু বললে, দেখা না হওয়ার জন্যে তিনি কতখানি আঘাত স'য়ে গেলেন তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না নিরু! বিশুর কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ল।

নিরু একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি বুঝতে পারছি এ আঘাত তোমার পক্ষে কতখানি কঠিন, কিন্তু তবুও, ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি তোমাকে ভেঙে পড়তে দেবো না।

১০

যুগলবাবুর মৃত্যুর পর সকলে কাশী থেকে দেশে ফিরে গেলেন। যতীনবাবু ইতিমধ্যেই একটা চক্রান্ত পাকিয়ে তুলেছেন খবর পাওয়া গেল—সুতরাং নায়েবমশাইও আর একটি দিনও অপেক্ষা করতে পারেননি। যতীনবাবুর আচরণে সকলেই বিস্মিত।

শ্রাদ্ধ শান্তি সমস্তই দেশের বাড়ীতে সম্পন্ন হবে এবং সেই অনুযায়ী বিশুকে জানানো হোলো, সে যেন কলকাতা থেকে সটান দেশের বাড়ীর দিকে চলে যায়। বিশু জবাব পাঠিয়েছে, তাই সে যাবে।

দেশের দিকে রওনা হবার সময় বৌরাণীর সঙ্গে চললেন সূর্যমুখী—তিনি অনেকটা পার্শ্বচারিণীর মতো হ'য়ে বৌরাণীর পরিবারভুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া সূর্যমুখীর আচার আচরণে ও সেবাপরায়ণতায় সকলেই মুগ্ধ। সূর্যমুখীও অতি সহজে এবং অনায়াসে সকলকে আপন ক'রে নিয়েছেন।

বৌরাণী বিধবার বেশে দেশের বাড়ীতে ফিরে শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করছেন। তাঁর শয়নকক্ষের সামনে দরদালানে ৺যুগলবাবুর বৃহৎ তৈলচিত্র দেখা যায়। এ পাশে বিশুর একটি বড় ছবি ঝুলছে। আজ বিশুর আসবার দিন।

বৌরাণী কি যেন কাজে ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন, দেখলেন বিশুর ছবিটির প্রতি সূর্যমুখীর একাগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ। সূর্যমুখী কেমন যেন

আনমনা। যাবার সময় থম্‌কে বৌরাণী বললেন, হ্যাঁ, ওই আমার ছেলে।

সূর্যমুখী যেন অভিভূতের মতো বললেন, ও, তোমার ছেলে! বেশ ছেলে!

বৌরাণী হাসিমুখে বললেন, ওর নাম বিশ্বনাথ—বিশু ব'লে সবাই ডাকে।

সূর্যমুখী গদগদভাবে বললেন, ও, বিশু!

বৌরাণী বললেন, তুমি অত ক'রে কী দেখছ দিদি?

সূর্যমুখী বললেন, না—না—কিছু না! দেখছি—বেশ ছেলেটি!

বৌরাণী সস্নেহে স্মিতমুখে বললেন, এই ত' সকালের গাড়ীতেই বিশু এসে নামবে—হয় ত' নেমেছে এতক্ষণ!—আমি খবর নিই!—মোক্ষদা—মোক্ষদা—

মোক্ষদা কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। বৌরাণী বললেন, নায়েবমশাইকে বলগে যা,—ছোটবাবুর জন্যে ষ্টেশনে লোকজন গেছে.ত?

ঝি বললে, হ্যাঁ মা, আমি জানি, তারা অনেকক্ষণ গেছে—এই এলো ব'লে!

বৌরাণী বললেন, আচ্ছা—যা—

মোক্ষদা চ'লে গেল।

বৌরাণী নিজের মনে বললেন, ভালোয় ভালোয় শ্রাদ্ধের কাজটা এখন হ'য়ে গেলে হয়!

সূর্যমুখী বললেন, ভালোয় ভালোয় চুকবে বৈকি, বোন। এ কর্তার কাজ, একাজে কোনো বাধা হবে না।

বৌরাণী বললেন, তাই বলো দিদি, আমাদের সকলের যেন মুখরক্ষে হয়।

এমন সময় বাইরে নায়েবমশাই ও বিশুর গলার আওয়াজ

শোনা গেল। নীচে থেকে নায়েবমশাই তখন বলছেন, এ-বাড়ীর কাজে কত যে হাঙ্গামা ছোটবাবু—

বিশু বলছিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, নায়েবমশাই—

বৌরাণী বললেন, ওই বিশু এসেছে!—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এলো। পুনরায় সূর্যমুখির দিকে চেয়ে বললেন, আজ মা-ছেলে দু'জনের চেহারাই আলাদা!—দিদি, তুমি ভাই একটু জলখাবার এনে দাওনা!—হয়ত বাছা গাড়ীতে কিছু খেতেই পায়নি!

সূর্যমুখী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সম্মুখে বিশুর ছবি ও নীচে বিশুর কণ্ঠস্বরকে কেমন ক'রে যেন অভিভূতের মতো মেলাতে লাগলেন।

নীচে থেকে বিশুর কণ্ঠস্বর তখনও শোনা যাচ্ছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন নায়েবমশাই—আগে আমি মার কাছে যাই!—এই ব'লে সে উপরে আসার পথ ধরলো।

এদিকে বৌরাণী ডাকলেন, দিদি—

সূর্যমুখী যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, ও,—এই যাই—হ্যাঁ—যাচ্ছি—যাচ্ছি—বলতে বলতে তিনি যেন অপরাধীর মতো ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন।

উপরে উঠে এসে বিশু বৌরাণীর কাছে এলো। তা'র বাঁ হাতে একটি আসন—পরনে শাদা ধুতি ও কাছা গলায়—মুখে গোঁফ-দাড়ি। বিশুকে দেখেই বৌরাণী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। কান্না কিছুক্ষণ পরে শান্ত হ'লে বিশু দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললে, মা—

বৌরাণী বললেন, বাবা—

বিশু বললে, এমন হবে এ আমি কখনো ভাবিনি, মা। এমন জানলে আমি কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে যেতুম না!

দু'জনের চোখ বেয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে লাগলো।

বৌরাণী বললেন, আমরা সকলেই তাঁকে মানা করেছিলুম বাবা, কিন্তু কা'রো কথা তিনি শুনলেন না—কাশী গেলেন।

বিশু বললে, আমি জানি মা, এ শোধ তিনি আমার ওপরেই নিলেন, আমারই অপরাধ। আমায় তুমি ক্ষমা করো, মা।

বৌরাণী বললেন, তুই কাছে ছিলিনে বাবা, কিন্তু ক্ষমা যাঁর করবার তিনিই ক'রে গেছেন।

বাইরে থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ছোটবাবু—

বলতে বলতে নায়েবমশাই এসে ঢুকলেন। বললেন, এই যে, এখানেই আছো। ছোটবাবু, একবার এদিকে এসো, নৈলে কাজ এগোয় না। এদিকে আর হাতে সময় নেই—

বিশু বললে, হ্যাঁ, এই যাই, যাচ্ছি নায়েবমশাই—

নায়েবমশাই বললেন, আজকের ডাকে নেমন্তন্নর চিঠিগুলো না ফেললে লোক এসে পৌঁছতেই পারবে না! এসো তাড়াতাড়ি—

হ্যাঁ, চলুন—বলে বিশু নায়েবমশাইয়ের পিছনে পিছনে চলল। বৌরাণী ডেকে বললেন,—বিশু, একটু জল খেয়ে গেলে হোতো না, বাবা?

বিশু বললে, এখুনি আসছি মা। তুমি একখানা নতুন ধুতি আনো—এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই চুপিচুপি নায়েবমশাই বললেন, ওখানে রাণীমার সামনে তখন বলিনি—যতীনবাবুর কাছে কি চিঠি পাঠাবো?

বিশু বললে, না, তাঁর কাছে কোনো চিঠি যাবে না!

নায়েবমশাই বললেন, আমারও তাই ইচ্ছে ছোটবাবু, কিন্তু রাণীমা—

বিশু বললে, মা কি বললেন?

নায়েবমশাই বললেন, তাঁর ইচ্ছে, কেউ না বাদ যায়—এটা কর্তার কাজ—

বিশু বললে, যতীনবাবুর ওপর বাবা একেবারেই খুশী ছিলেন না, সুতরাং বাবার কাজে তাঁর আসা হবে না—মাকে আমি বুঝিয়ে বলছি —এই ব'লে সে আবার ভিতরের দিকে গেল।

ওদিকে তখন ভিতরের ঘরে সূর্যমুখী প্রবেশ করছেন। তাঁর হাতে জলখাবারের থালা! তিনি ধীরে ধীরে এসে থালা হাতে বিশুর ছবির দিকে চেয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

বিশু তাড়াতাড়ি এসে ডাকলো, মা—

সূর্যমুখী পিছন ফিরে থেকেই মাথায় কাপড় টানলেন।

বিশু বললে, মা, তুমি নাকি যতীনবাবুকে নেমন্তন্ন করার কথা বলেছ? উনি বাবাকে কি রকম বিরক্ত করেছিলেন, তোমার মনে নেই? তিনি এখানে সুধু কাজ পণ্ড করতেই আসবেন—চারিদিকে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবেন।—মা, কথা বলছ না যে? চুপ ক'রে রইলে কেন?—একটু থেমে পুনরায় সে বললে, ও, বেশ,—তাই হোক—তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি চললুম—নায়েবমশাইকে ব'লে দিই—

এই ব'লে সে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল, আবার কি যেন ভেবে ফিরে এসে বললে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি মা—যতীনবাবু এসে যদি—

সূর্যমুখী সামনে ফিরে দাঁড়ালেন। বিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে সহসা চীৎকার ক'রে উঠলো; একি—মা—মা তুমি?—

সূর্যমুখীর কম্পিত হাত থেকে থালা প'ড়ে গেল ঝন্ ঝন্ শব্দে। দুইটি ব্যগ্র বাহু বিস্তার ক'রে তিনি বিশুর দিকে এগিয়ে এলেন,—বললেন,—মাণিক—মাণিক—বাবা—

অধীর আর্ত-পক্ষী-শাবকের মতো বিশু এতকাল পরে প্রাণ ভ'রে ডাকলো,—মা—মা—কোথায় ছিলে তুমি? মা—মাগো—

দু'জনের গলার আওয়াজ পেয়ে বৌরাণী ও-ঘর থেকে ছুটে এলেন। বললেন কেন রে, আমাকে ডাকছিস, বিশু,—এই যে আমি—

ঝড়ের মতো তিনি এ ঘরে এসে ঢুকলেন। সহসা এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখে তিনি হতচকিতভাবে স্তব্ধ হয়ে বললেন, একি বিশু—দিদি—এ ত' আমি—আমি কখনো ভাবিনি! আজ একি শুভদিন? উনি বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারলেন না?

ধীরে ধীরে বৌরাণীর চোখে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঘনিয়ে এলো।

সুদীর্ঘ পনের বৎসর পরে মাতা ও পুত্রের মিলন ঘটলো।

এই মহিমাময় দৃশ্য দেখার জন্য বাড়ী ও কাছারীর সমস্ত জনতা ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আনন্দ করতে লাগলো।

বিশু হাসিমুখে বললে, তুমি আবার আমাকে মাণিক ব'লে ডাকবে ত' মা?

সূর্যমুখী হাসিমুখে বললেন, না। কাশী গিয়ে বাবা বিশ্বনাথকে ডেকে ডেকে আবার তোকে পেয়েছি! তুই আমারও বিশু!—তা ছাড়া—

বিশু বললে, কি মা?

সূর্যমুখী বললেন, যেদিন আমাকে হারিয়ে তুই পথে পথে ঘুরে-ছিলি, যেদিন তোর আর কেউ ছিল না—সেদিন যারা তোকে কোলে তুলে নিয়েছিল, তারা যে আমার কত আপন—তোকে বুঝাতে পারবো না, বিশু। তুই আমার বুকের মাণিক, সুখের বিশু!

এমন সময় নায়েবমশাই এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এই যে বড়মা—

সূর্যমুখী বললেন, এসো বাবা।

নায়েবমশাই বললেন কী সৌভাগ্য যে সকালে মা-অন্নপূর্ণার দর্শন পেলুম। এ বুড়োর মাথাটাও ওই পায়ে একবার ঠুকতে দিন্ মা—

নায়েবমশাই সূর্যমুখীর পায়ে প্রণাম করলো।

বিশু বললে, নায়েবমশাই, আপনার হাতে কাগজখানা কি ?

নায়েবমশাই সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই দেখো, আসলেই ভুল ! আরে এইজন্যেই ত' এসেছি ! এই ছাখো—ছাখো—তোমার সেই বক-ধার্মিক 'যতীনকাকা'র কাণ্ড !

বিশু বললে, কি হয়েছে, নায়েবমশাই ?

নায়েবমশাই বললেন, যা হবার তাই হয়েছে ! তোমাকে কতবার বলেছি, ছোটবাবু এ লোকটা হোলো বহুরূপী !—কর্তামশাই কতবার আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলেছেন—ওহে নায়েব, কেবল হাত কচ্‌লাতেই শিখেছ, আর 'যে-আজ্ঞে'ই শিখেছ—মানুষ চিনতে শেখোনি ! আমি মনে মনে ভাবতুম,—হুঁ হুঁ—কাকে না চিনি !

বাইরে থেকে কথাবার্তা শুনে বৌরাণী ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, কি, কি হয়েছে নায়েবমশাই ?

নায়েবমশাই বললেন, শমন এসে হাজির, রাণীমা ! যতীনবাবু নালিশ করেছেন। জমিদারীটা নাকি সবই তাঁর, আমরা সবাই তাঁকে ঠকিয়ে খাচ্ছি !

বৌরাণী অপার বিস্ময়ে বললেন, সত্যিই তবে যতীন ঠাকুরপো নালিশ করেছেন !

বিশু বললে, আশ্চর্য, এ আমরা কখনো ভাবিনি !

বৌরাণী গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ঠাকুরপোর এতখানি দুঃসাহস ?

নায়েবমশাই বললেন, দুঃসাহস নৈলে আর সাপের গর্তে হাত দেয় মা ! কি বল্‌ব, কর্তামশাই ছিলেন নির্বিরোধী—তাঁর হুকুমে মামলা-মোকদ্দমা একরকম ভুলেই ছিলুম। কিন্তু এবার যতীনবাবুকে বেশ ভালো ক'রেই দেখবো,—আমরা ঢোঁড়া সাপ নই—আমরা সেই পুরনো আমলের জমিদার—সেই চিরকেলে জাত সাপ !

বৌরাণী বললেন, কিন্তু নায়েবমশাই—

নায়েবমশাই বললেন, না মা, আপনি আর কারো মুখ

চাইবেন না। যে-ফাঁদ তিনি নিজেই পেতেছেন, সেই ফাঁদেই আমি তাঁকে বাঁধবো—তবেই আমার নাম মহেশ মুখুজ্যে। ব'লে গেলুম ছোটবাবু, মা আপনিও দেখে নেবেন, যতীন বাঁড়ুয্যে কেমন ক'রে নিজের ভিটেয় নিজেই ঘুঘু চরান্।

এই কথা ব'লে কারো কথা না শুনে তিনি ঘর থেকে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে আদালতে মামলা উঠলো। কিন্তু একখানা অত্যন্ত মোক্ষম কাগজ নায়েবমশাইয়ের হাতে থাকার জন্য মামলার সমস্ত চেহারাই একদিনে বদলে গেল। মোকদ্দমাটা দেওয়ানী থেকে ফৌজদারীতে গিয়ে দাঁড়ালো। এই রকম একদিন অপরাহ্ণে নায়েবমশাই হাসিমুখে বাড়ী ফিরে সোজা অন্দরমহলে গিয়ে বৌরাণীকে ডাকলেন। বৌরাণী এলেন সমস্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে। তারপর নায়েবমশাইকে দেখে মামলার কি হোলো জিজ্ঞাসা করলেন।

নায়েবমশাই কৃত্রিম বিষণ্ণ সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, যতীনবাবু নিজের জালে নিজেই জড়ালেন। তাঁর জেল হবে, মা!

বৌরাণী ভীতকণ্ঠে বললেন, জেল হবে! কি বলছেন, নায়েবমশাই। একটু দাঁড়ান্, পূজোটা সেরে আসি—সব শুনবো। এই ব'লে তিনি ঠাকুর-ঘরে চ'লে গেলেন।

সেই সময় এদিকের বারান্দায় বিশুকে দেখে মোক্ষদা ডাকলো, ছোটবাবু—

বিশু বললে, কি রে?

মোক্ষদা বললে, একজন মেয়েছেলে এসেছে, আপনার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চায়!

বিশু বললে, মেয়েছেলে! আমার সঙ্গে? কে? নাম কি? সহসা নিরুর চেহারাটা এবাড়ীতে কল্পনা ক'রে তা'র বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো।

মোক্ষদা বললে, তা বলেনি, শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়!

শুধু আমার সঙ্গে? চল্ দেখি, এই ব'লে বারান্দা পেরিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

বিশু নেমে এসে দেখলো, একটি মহিলা দাঁড়িয়ে। ঘোমটার ভিতর থেকে তাঁর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না। বিশু বললে, কে আপনি?

মৃদুকণ্ঠে মহিলাটি বললেন, আমাকে বোধ হয় তুমি চিনবে না, বাবা।

বিশু প্রশ্ন করলে, কি দরকার, বলুন?

আমার স্বামীর জন্যে এসেছি তোমার কাছে!

বিশু বললে, বলুন, কি বলতে চান—

মহিলাটি সবিনয়ে বললেন, আমার স্বামীর জেল হবে, কিন্তু তুমিই তাঁকে বাঁচাতে পারো, বাবা।

বিশু সচকিত হয়ে বললে, ও, আপনি যতীনবাবুর স্ত্রী!—কিন্তু দেখুন, এ বিষয়ে আমার কোনো কথা বলবার নেই। এসব নায়েবমশাই জানেন, আর মা জানেন। আপনি বরং তাঁদের কাছে যান্!

মহিলাটি করুণ কণ্ঠে বললেন, না বাবা, স্বামীর জন্যে ওঁদের কাছে কিছু বলবার মুখ আমার নেই, তাই লুকিয়ে তোমারই কাছে এলুম। তোমার হাত ধরেই বলছি, বাবা—

এই ব'লে তিনি ঘোমটা সরিয়ে মুখ তুললেন, তাঁর মুখখানা লক্ষ্য ক'রেই বিশু যেন চমকে উঠলো। সহসা সে বললে, আপনাকে

যেন আগে দেখেছি মনে হচ্ছে—। আচ্ছা, বাসন্তীপুর গ্রাম আপনি জানেন ?

—হ্যাঁ জানি বৈ কি—বাবা—

বিশু বললে, সে-খা-ন কা-র—সেখানকার ঠাকুরবাড়ী ?

—হ্যাঁ—

বিশু অধীর কণ্ঠে বললে, সেখানে বছর-বছর রামনবমীতে কাঙালীদের ভাত খাওয়ানো হয়, না ?

মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ বাবা, সে-ঠাকুরবাড়ী আমারই—

বিশু বললে, ও! তা'র মায়ের সেই সই সুরবালাকে এবার চিনতে বিশুর আর দেরী হোলো না। সে বললে, আচ্ছা, সেখানে উপবাসী মানুষ আর পথের কুকুর একই ব্যবহার পায়, সেটা কি আপনারই হুকুমে ?

সুরবালা সবিস্ময়ে বললেন, এসব কি বলছ বাবা, এরকম হুকুম কি মানুষে দিতে পারে ?

বিশু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, পারে বৈ কি ? ঠিকই বলছি, আপনারা অনেক টাকার মালিক, টাকার জোরে পৃথিবীকে শাসন করেন, টাকার অহঙ্কারে গরীবের বুক পা দিয়ে মাড়িয়ে যান—আপনাদের সেই ঠাকুরবাড়ীতে মানুষ আর কুকুর বোধ হয় একই—কি বলেন ?

সুরবালা নরম শুরে বললেন, তুমি রাগ করছ কেন, বাবা ?

না রাগের কথা নয়, আমার মনের কথা। একদিন আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে কুকুরের মতন মার খেয়েছিলুম, আপনারা আমার মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিলেন—তাই মনে আছে! বিশুর কণ্ঠে অতীত যেন কথা কয়ে উঠল।

সুরবালা সবিস্ময়ে বললেন, তুমি—তুমি কে বাবা ? তোমার ওপর জুলুম হয়েছে, কই—মনে পড়ে না ত ?

বিশু বললে, যে মারে সে মনে রাখে না—যে মার খায় সে কোনোদিনই ভোলে না—তা জানেন ত? হ্যাঁ, আমাকে যাই-বা চিনলেন, কিন্তু গরীব ব'লে যাঁকে একদিন ইচ্ছে ক'রে আপনি চেনেন নি—আমি তাঁরই ছেলে!

সুরবালা হতাশ কণ্ঠে বললেন, কে তিনি? তবে কি—তবে কি বাবা, যেমন এসেছি তেমনি আমাকে ফিরে যেতে হবে?

বিশু বললে, এর জবাব আমি আপনাকে দিতে পরবো না। আপনি আসুন ওপরে—

এই ব'লে সে আগে আগে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। সুরবালা সভয় কুণ্ঠার সঙ্গে বিশুর অনুসরণ করলেন।

সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে উঠে দরজার কাছে এসে বিশু বললে, একটু দাঁড়ান্ এখানে—এই বলে সে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ডাকলো, মা—

সূর্যমুখী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি রে?

বিশু বললে, একটা কথা, মা—

সূর্যমুখী বললেন, কি বল্।

বিশু বললে, বাসন্তীপুর গ্রামের ঠাকুরবাড়ী তোমার মনে পড়ে?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ, পড়ে বৈ কি! বাবা—

বিশু বললে, সেখানে একদিন আমার মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিল, তোমাকে আমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়েছিল—মনে আছে?

সূর্যমুখী ঈষৎ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, আছে, ভুলিনি।

বিশু বললে, সেখানে একদিন একজন তোমাকে ইচ্ছে ক'রে চিনতে পারেনি, মনে পড়ে কি?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ, তাও ভুলিনি।

বিশু বললে, কার কথা ভোলোনি, বলো ত?

সূর্যমুখী বললেন, একদিন যাকে সই ব'লে ডাকতুম।

বিশু বললে, তা হ'লে বাইরে এসো—

বিশুর পিছনে পিছনে সূর্যমুখী দ্রুত বাইরে এলেন। বাইরের বারান্দায় অশ্রুনতমুখী সুরবালা এবার মুখ তুললেন।

বিশু সুরবালাকে সম্বোধন ক'রে বলল, দেখুন ত ভালো ক'রে, এবার এঁকে চিনতে পারেন কি না?

সূর্যমুখী বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, এ কি? তুমি? সই?

সুরবালা কেঁদে বললেন, তুমি? সই?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ—কতদিন পরে দেখা! তোমাকে আর কোনোদিন দেখবো এ আশা আমি করিনি সই!

সুরবালা নতমুখে বললেন, কিন্তু দেখা দেবার মতন মুখ আর আমার নেই, সই! আমি তোমার পায়ে ধরতে এসেছি!—আমাকে তুমি ক্ষমা করো বোন্।

সূর্যমুখী হতচকিত হ'য়ে বললেন, ওমা, সে-কি? পায়ে ধরতে? ছি ছি, এমন কথা বলতে নেই, তুমি যে আমার সেই ছোটবেলাকার, সেই বড় আদরের সই!—এসো, ভেতরে এসো। তুমি দোষ করেছিলে আমার কপালদোষে, সই—তোমার কোন দোষ নেই! এসো!

বিশু স্তব্ধ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এলেন বৌরাণী। এসেই দু'জনকে দেখে বললেন, একি ছোট বৌ? দিদি?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ বোন্, আমরা দু'জনে ছোটবেলার, সই!

সুরবালা সজলচক্ষে চেয়ে বললেন, দিদি, তোমার ঠাকুরপোকে তোমরা বাঁচাও।

বৌরাণী বললেন, ছোট বৌ, যতীন ঠাকুরপোর কিছু হবে না—আমি কথা দিচ্ছি! আমি যে ঠাকুরের কাছে মানত ক'রে রেখেছি! বিশু, চুপ ক'রে থাকিসনে—ছোট বৌকে তুইও কথা দে।

বিশুর মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে ক্ষমায় ও প্রসাদগুণে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। হাসিমুখে সে বললে, তুমি কথা দিলে, সেই ত' আমার কাছে সকলের বড় হুকুম মা।

সুরবালা জলভরা নেত্রে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

১১

কতকাল পরে দুই সইতে দেখা হোলো—সে যুগান্তরের কথা। কত গল্প, কত আলাপ, কত ঘটনা ও মনের কথা—

সূর্যমুখী বললেন; সে আজ কতদিনের কথা মনে পড়ে, সই?

সুরবালা বললেন, পড়ে বৈ কি! দিনরাত পুতুল খেলা নিয়ে আমাদের কত ঝগড়া ঝাঁটিই না হোতো!

সূর্যমুখী বললেন, শুধু ঝগড়া! ভাব হ'তেও দেরি হেতো না!

সুরবালা হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ,—এই ছাখো না, বুড়ো হ'তে চললুম, এখনও সেই ঝগড়া আর সেই ভাবই চল্‌ছে। নৈলে কে জানতো সই, আবার দু'জনে দেখা হবে, আবার পুরণো কথা মনে হবে—

সূর্যমুখী হাসলেন। বললেন, আবার দু'জনে মান-অভিমানের পালা গাওয়া হবে!

সুরবালা বললেন, না ভাই, মান-অভিমান আর নয়! কিন্তু ছোটবেলার সবচেয়ে দামী কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে এলুম, সই!

সূর্যমুখী বললেন, কি বলো ত ?

সুরবালা বললেন, সেই-যে দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আমার যদি মেয়ে হয়, আর তোমার যদি ছেলে হয়—তাহলে—মনে পড়ে ?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ, কিছু ভুলিনি—আমরা ঠিক করেছিলুম, সেই ছেলের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দেবো !

সুরবালা উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাহ'লে আমাদের সেই ছোটবেলা আবার ফিরে আসুক ! তোমার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের এবার সত্যি বিয়ে হোক ?

সূর্যমুখীও উৎসাহিত হলেন। বললেন, বেশ ত ! বৌরাণীকে ব'লে এই ফাল্গুনেই আমি দিন ঠিক ক'রে ফেলি !

সুরবালা বললেন, তা হ'লে পাঁজি দেখাদেখি হোক, সই !

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ, এক্ষুণি—

সুরবালা বললেন, বেশ, তবে যাই—ওঁকে সুখবরটা দিই গে, সই !

এই ব'লে সুরবালা সেদিন অপ্রত্যাশিত আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বিদায় নিলেন।

সুরবালা বাড়ী ফিরলেন প্রায় সন্ধ্যায়। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বললেন, ও গো, শুন্‌ছ ?

যতীনবাবু বললেন, এসেছ ? কি খবর ?

সুরবালা বললেন, আজ আমাদের পুরণো ইতিহাস সব প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। বল্‌ছি একে একে, দাঁড়াও ! আজ বড় আনন্দের দিন ! সইয়ের ছেলের সঙ্গে খুকির বিয়ে !

যতীনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, বলো কি ? তোমাদের ছোট-বেলাকার কথা সত্যি হয়ে উঠলো ?

সুরবালা সানন্দে বললেন, তোমার ব্যাপার আমি সব মিটিয়ে এসেছি, ওরা ক্ষমা করেছে।

যতীনবাবু আক্ষেপের সুরে বললেন, আমিও ভুল করেছিলুম ছোট বৌ। ওরা এত ভালো আগে জানিনি।

সুরবালা হাসিমুখে বললেন, সব ভালো যার শেষ ভালো। তা হ'লে আমাদের খুকির সঙ্গে বিশুর বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলি, কি বলো?

যতীনবাবু আনন্দের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই! শুভস্য শীঘ্রম্!

সুরবালা তখন সমস্ত কাহিনী গুছিয়ে বলতে বসলেন।

বিশু প্রথমদিকে কানাকানিটা বিশ্বাস করেনি—হেসে উড়িয়ে দিয়ে ছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা ঘনিয়ে উঠলো, তখন তা'র পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলো। একদিন সে মায়ের ঘরে ঢুকে বললে, মা তোমরা এসব কী ছেলেমানুষি করছ, শুনি?

সূর্যমুখী সহাস্যে বললেন, ও কথা বলতে নেই বাবা,—এ বিয়ে আজ তিরিশ বছর আগে ঠিক হ'য়ে আছে!

বিশু একটু উত্তেজিত ভাবেই বললে, আমার জন্মাবার আগেই আমার বিয়ের ঠিক হ'য়ে আছে? এ হ'তে পারে না, মা—

সূর্যমুখী একটু চঞ্চল ও উদ্বিগ্নভাবে বললেন, তোর কথা শুনলে ভয় করে, বিশু। তুই কি চাস, লোকের কাছে আমি মিথ্যেবাদী হই?

বিশু একটু আহত হোলো। বললে, তুমি কি চাও মা, আমি তোমার কথার অবাধ্য হই?

সূর্যমুখী একটু অসহায়ভাবে বললেন, আমি যে সুরবালাকে ছোট-বেলা থেকে কথা দিয়ে রেখেছি, বিশু!

বিশু বললে, সেটা ছোটবেলাকার কথা, মা!

সূর্যমুখী বললেন, কিন্তু তা'র দাম যে অনেক!

বিশু বললে, যদি সে-দাম তোমার ছেলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে? মনুষ্যত্ব ছাপিয়ে ওঠে?

সূর্যমুখী বললেন, মায়ের কথা রাখলে তোর মনুষ্যত্ব ছোট হবে না, বিশু!

বিশু বললে, কিন্তু নিজের কাছে আমি যে কত ছোট হ'য়ে যাবো, তা তোমরা কেউ জানো না, মা! এই ব'লে সে যাবার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু সূর্যমুখী তাকে ডাকলেন, বিশু—

বিশু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। বললে, কি, বলো মা?

সূর্যমুখী বললেন, কথা না রাখলে ধর্মের হানি হবে যে!

বিশু অশান্ত কণ্ঠে বললে, এ তুমি কী বল্‌ছ মা? তোমার ধর্ম কি এই কথা বলে, ছেলের ভালো মন্দ কিছু চাইতে নেই? তোমার কথার অবাধ্য আমি হ'তে পারবো না, তবু তুমি এই কথা বলছ, মা?

সূর্যমুখী সভয়ে বললেন, কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমি যে কথা দিয়ে রেখেছি রে?

বিশু বললে, সেটা ছোটবেলাকার কথা, তা'র দাম কতটুকু? আমাকে তোমরা এমন বিপদে ফেলো না, মা!—এই ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সূর্যমুখী পিছন থেকে ডাকলেন, বিশু—বিশু—শোন্—

কিন্তু বিশু চ'লে গেল সেখান থেকে।

এমন সময় বৌরাণী ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, কি হোলো দিদি?

সূর্যমুখী কাতরকণ্ঠে বললেন, বিশু এ-বিয়েতে রাজী নয়!

বৌরাণী সবিস্ময়ে বললেন, সে কি?

সূর্যমুখী বললেন, হ্যাঁ, সে আমার কথা শুনলো না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো বোন্—আমি যেন মিথ্যেবাদী না হই—কখনো মিথ্যে আমি বলিনি!

বৌরাণী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়ালেন। তারপর যাবার সময় ব'লে গেলেন, আচ্ছা, আমি বলছি!

বিশু মার কাছ থেকে চলে এসে শোবার ঘরে ঢুকল। নিজের মনে বললে, না, না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না—এ হয় না, এ হ'তে দেবো না—

কিন্তু একটি একটি ক'রে সকলের কথা যেন তা'র কানে বাজতে লাগলো।

বৌরাণী যেন বলছেন, মাকে মিথ্যেবাদী করিসনে, বিশু, মা তোর সকলের বড়! অনেক দুঃখে তোকে মানুষ করেছে!

সুরবালা যেন বলছেন, আমার অনেকদিনের আশা, আমার মেয়েকে সইয়ের ছেলের হাতে তুলে দেবো!

নায়েবমশাই যেন বলছেন, ছোটবাবু, মায়ের কথা রাখলে স্বর্গ থেকে কর্তামশাইও আশীর্বাদ করবেন!

বৌরাণী যেন বলছেন, বিশু, আমাদের মান রাখ্ বাবা, তোর কাছে আমরা অনেক আশা করি।

মা যেন বলছেন, বিশু, লোকের কাছে আমি যেন মিথ্যেবাদী না হই! ছোট বেলা থেকে কথা দিয়ে রেখেছি যে!

বিশু অস্থির হয়ে উঠলো। তা'র মনে ঝড় উঠেছে। ও-ঘরে গিয়ে সে চিঠি লিখতে বসল। প্যাডের ওপর কিছুক্ষণ হিজিবিজি কাটাকুটি করল—পরে কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কি ভেবে

এগিয়ে এসে জানালা খুলে দাঁড়াল। বাইরে বাতাস তখন তীব্র হয়ে উঠেছে—ঝড়ের ঝাপটা লাগছে তা'র মুখে চোখে, ঝড়ের দাপটে প্যাডের কাগজ উড়ে গেলো। দেয়ালের ছবি উল্‌টে পড়ল—ঘর হোলো ওলোট-পালট—সেই বায়ুগর্জনের মধ্যে বিশুর অশান্ত আতুর কণ্ঠ নিজের মনে বলতে লাগলো, না না, বিশু তুমি রাজি হোয়ো না, এ হ'তে পারে না।

এমন সময় বৌরাণী ঘরে এসে ঢুকলেন। স্নেহভরা দৃষ্টিতে বিশুর দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকলেন, বিশু—

বিশু মুখ ফিরিয়ে তাকালো! দৃষ্টি তার অশান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত।

বৌরাণী বললেন, আমাকে বল্‌ সত্যি ক'রে, তোর কি হ'য়েছে?

বিশু করুণ সুরে বললে, বল্‌তে পাচ্ছিনে মা—

বৌরাণী বললেন, বলতে আমাকেই তুই পারিস, বিশু!

বিশু বললে, মা! কণ্ঠ তার রুদ্ধ আবেগে কাঁপছে।

বৌরাণী বললেন, হ্যাঁ, বল্‌!

বিশু কাতরকণ্ঠে বললে, কিন্তু—মনের কথা তোমরা যে শুনতে চাও না!

বৌরাণী বিস্ময় কৌতূহলে বললেন, তোর মনের এমন কী কথা, যা আমাকেও শোনাতে চাসনে?

বিশু অশান্তকণ্ঠে বলে, চাই, তোমাকেই শোনাতে চাই। তুমি আমাকে সাহস দাও মা, কেউ যেন কোনো দিন আমার হাতে অবিচার না পায়।

বৌরাণী সস্নেহে বললেন, অবিচার তুই কারো ওপর কখনো করবিনে, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কার কথা বলছিস?

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়িয়ে বিশু হঠাৎ বলে উঠলো, আর কিছু তুমি জানতে চেয়ো না মা। আমি একবার

কলকাতায় যেতে চাই, আমাকে তোমরা মানা করো না, মা!
বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৌরাণী চুপ ক'রে তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোথায় কি যেন একটা ঘটেছে, সেটা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না। স্তব্ধভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

১২

বিশু কলকাতায় চ'লে এলো। নিজের বাসায় এসে নিঃশব্দে দিনচারেক ব'সে রইলো নিষ্ক্রিয়ভাবে। চারদিনের দিন চিঠি এলো দেশের বাড়ী থেকে,—মা লিখেছেন। সেই কথা,—'তাঁর ধর্ম বিপন্ন। মায়ের প্রতিজ্ঞা পালন করা মনুষ্যত্বের ধর্ম।' বিশু যেন মনে মনে ঝড়ে বিধ্বস্ত হ'তে লাগলো। যেন কোথাও কূল নেই,—আশা নেই,—অন্ত নেই।

নিরুর কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে,—কিন্তু কোন্ মুখে দাঁড়াবে? দাদুকে সব কথা খুলে বলবে, কিন্তু কি বলবে? এমন অভিযোগ আসতে পারে, সে এতদিন ভালোবাসার অভিনয় ক'রে এসেছে মাত্র! পরীক্ষার দিন যখন এলো, ভালোবাসা টিকলো না। না, সেখানে যাবার তার কোনো মুখ নেই আর।

কিন্তু কী যেন ভেবে সহসা একদিন সে উঠে দাঁড়ালো। জামাটা গায়ে চড়িয়ে দরজায় তালা দিয়ে সে চললো নিরুর বাড়ীর দিকে। আর কিছু না হোক, সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার, দেখা দেওয়া

দরকার। নিজের ভিতরের মানুষটাই যেন এ-কদিন তা'কে ছি-ছি ক'রতে আরম্ভ করেছে।

ট্রাম থেকে নেমে কিছু দূর গিয়ে সে নিরুদের বাড়ীর দরজায় এসে উঠলো।

সেই সময় কোথায় যাবার জন্য নিরু উপর থেকে নীচে নেমে এলো। এসে বাইরের ঘরে ঢুকেই সে বিশুকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো। বিশু ইতিমধ্যে এসে একান্তে যেন অসীম চিন্তা-সমস্যা নিয়ে বসে রয়েছে—তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে তা'র পিঠে হাত রেখে সস্নেহে নিরু বললে, একি, তুমি? কখন এলে? বারে, বেশ যা হোক—আমাকে এতক্ষণ ডাকোনি যে?

বিশু মুখ তুললো। কথা বললো না।

নিরু প্রশ্ন করল, কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?

বিশু ক্লান্তকণ্ঠে নতমুখে বললে, কোন্ কথা দিয়ে কথা বলব—তাই ভাবছি।

নিরু সবিস্ময়ে বললে, মানে? কী বলছ?—এতদিন পরে এসে তোমার মুখে কথা ফুরিয়ে যাবে, এই কি আমি আশা ক'রেছিলুম? —এই বলে সে বিশুর পাশে এসে বললো।

বিশু মুখ তুলে বললে, তুমি যা আশা করো না, এমন ঘটনাও ঘটে, নিরু!

নিরু অধীরকণ্ঠে বললে, এমন কী ঘটেছে, যা আমাকে বলতে পারছো না?—এই ব'লে ঝুঁকে প'ড়ে বিশুর হাতে হাত রেখে পুনরায় সে বললে, কোনো বিপদে পড়োনি ত?

বিশু চিন্তিত বিপন্ন-কণ্ঠে বললে, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো?

নিরু বললে, কিন্তু বিপদে পড়লে তুমি ত' উঠে দাঁড়াতে জানো!

বিশু বললে, জানি এইটিই জানতুম। কিন্তু—

নিরু বিশুর মুখের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো।

বিশু বললে, আজকের বিপদে তোমার কাছে সাহস না পেলে আমি উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, নিরু!

নিরু বললে, যদি বিপদেই প'ড়ে থাকো, সে-বিপদ তোমার ত' একার নয়!

বিশু বললে, তবে শোনো। তুমি আমি এতদিন ধ'রে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানকার মাটি আজ কেঁপে উঠেছে!—নিরু, আর কিছু নয়, শুধু ভাবছি, আমি যদি ভালো ক'রে মায়ের অবাধ্য হ'তে পারতুম!

নিরু অনেকক্ষণ কী যেন চিন্তা করলো। তারপর বললে, ও, বুঝেছি। তা হ'লে তুমি এই বল্‌ছ, মা চান্ না তুমি আর আমি—

বিশু বললে, মা হয়ত চাইতেন, কিন্তু তাঁর ছোটবেলাকার প্রতিশ্রুতি চায় না—তুমি আর আমি পাশে থাকি, কাছে থাকি! —তুমি-আমি যদি এক জায়গায় দাঁড়াই, সেখানে মায়ের সত্য, মিথ্যে হয়ে যাবে।

নিরু মুখ তুলে বিশুর মুখের দিকে তাকালো। তারপর কী যেন একটা স্থির ক'রে নতমুখে বললে, কিন্তু একটি কথা মনে রেখো। এতকাল পরে যে-মাকে এত দুঃখে তুমি ফিরে পেয়েছ, তাঁর কথার অবাধ্য হ'তে তোমাকে আমি দেবো না! আমার চেয়ে তোমার মা অনেক বড়।

বিশু সবিস্ময়ে বললে, এ তুমি কী বলছ, নিরু?

নিরু ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, যা বলা উচিত, সবাই যা বলতো!

বিশু উত্তেজিতভাবে বললে, সবাই যা বলতো, তোমার মুখ থেকে সেটা শোনার জন্যে এতদূর ছুটে আসিনি নিরু।

নিরু বললে, কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হ'য়ে যা তুমি পাবে, তা কি তোমার কাছে এতই বড়?

বিশু অস্থির উত্তেজনায় বললে, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট—সে কথা এখন থাক। চলো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি তোমাকে এখনি নিয়ে যাবো।

নিরু সবিস্ময়ে বললে, কোথায়?

বিশু উন্মাদের মতো বললে, যেখানে খুশি। যাবার আগে শুধু তোমার দাদুকে জানিয়ে যাবো। আমি সব দিক ভেবেই তোমার এখানে এসেছি।

নিরু শান্তভাবে বললে, না, তুমি যাও, আমি যাবো না। যেতে পারবো না। এই ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করলো।

বিশু বললে, তাহ'লে বলো আমার বিপদে তুমি আমাকে ত্যাগ করতেই চাও?

নিরু নিজের মুখের ভাব গোপন করলো। বললে, হ্যাঁ তা চাই বৈ কি।

বিশু রুদ্ধকণ্ঠে বললে, দাঁড়াও, তবে এ-কথাও বলে যাও, আমরা মনে মনে যে-ঘর বেঁধেছিলুম, সে সুধু খেলাঘর?

নিরু বললে, ঘর আমরা বাঁধিনি, স্বপ্ন দেখেছিলুম। সে-স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেল।

বিশু বললে, ও, যাবার আগে তাহ'লে এই কথাই জেনে যাই—খেলাঘর ব'লে তাই ভাঙলো; সত্যি ঘর হ'লে কোনদিন ভাঙ্‌তো না। শুধু খেলাঘর বেঁধে আমরা এতদিন শুধু খেলাই ক'রে এসেছি। বেশ—ব'লে হন্‌ হন্‌ ক'রে বিশু ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা চ'লে গেল।

কেমন যেন একটা আকস্মিক আঘাতে নিরু কেঁদে উঠল—বুঝতে পারলো না তাই কাঁদলো, বোঝাতে পারলো না তাই কাঁদলো। তা'র ভালোবাসা কাঁদলো, তা'র প্রাণ কাঁদলো—পৃথিবীর সকল

ব্যর্থ নারীর বুকের ব্যথা স্মরণ ক'রে কাঁদলো—সে শুধু আপন সত্তার উৎপীড়িত যাতনায় কাঁদলো। ঝরঝরিয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠলো। স্খলিত বেশ,—অতি শাস্ত, ক্লান্ত—তা'র আর কোনো শক্তি নেই—আর সে কিছু চায় না, কিছু কাম্য নেই—সমস্ত পৃথিবী তা'র চোখে বিষণ্ন, ভগ্ন—সে যেন সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেছে। ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত দুই পায়ে কোনোমতে নিজেকে ভর ক'রে সে সিঁড়ি বেয়ে অতি কষ্টে অতিশয় ক্লান্তির সঙ্গে উপরে উঠতে লাগলো—।

মাঝপথে বড় সিঁড়িতে পৌঁছে তা'র ভগ্ন-কণ্ঠ থেকে কান্নার মতো আর্তস্বর নিঃসৃত হ'য়ে এলো।

নিরু নিজের ঘরে ঢুকে সোফার উপর লুটিয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার সারা শরীর দুলে দুলে উঠছে। ইতিমধ্যে দাদু তা'কে কি যেন সাংসারিক প্রয়োজনে খুঁজছিলেন। নিরু যে আজ বেরোইনি, এটা তিনি চাকরের মুখে জেনেছেন। সুতরাং পা টিপে টিপে উপরে উঠে এ-ঘরে এসে নিরুর কাছে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, বলি দিদি, চুপটি ক'রে শুয়ে বুঝি কড়িকাঠ গুণছিস?—তোকে দেখে, বুঝলি দিদি, সেই গানটা মনে পড়ে,—

> যার লাগি ফিরি একা, আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
> তারই বাঁশী বাজে হিয়া ভরি।—জাগরণে যায় বিভাবরী।

হঠাৎ নিরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, একি দিদি, চোখে জল যে?

নিরু ভগ্নকণ্ঠে বললে, দাদু, কিছু শুনতে চেয়ো না—এই ব'লে উঠে সে দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অঝরে কাঁদতে লাগল।

দাদু হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, এমন শুভদিন, শুভক্ষণ, শুভলগ্ন—এমন সময় চোখে জল? তাহলে বল্ আনন্দের অশ্রু?

নিরু ক্রন্দনকম্পিতকণ্ঠে বললে, দাত্থ, আর আমার কিছুতে আনন্দ নেই!

দাত্থ বললেন, আছে দিদি, আছে, আনন্দ কি এতই দেউলে হয়ে গেছে যে, তোকে আনন্দ দিতে সে নারাজ?—ওঠ্, উঠে দাঁড়া—হেঁটে চল্—আমি তোকে পথ দেখাবো! আয়—

নিরু মাথা তুলে বললে, কোথায় দাত্থ?

দাত্থ উদ্ভাসিত মুখে বললেন, যেখানে আলো! সেখানে তোকে আমি দেখবো, নিজেকেও তুই দেখবি!—আয়—চল—

নিরু বললে, দাত্থ—!

দাত্থ বললে, কি দিদি?

নিরু বললে, মনের আলো যদি নিবে গিয়ে থাকে, বাইরের আলো কেমন ক'রে দেখবো?

দাত্থ সানন্দে হাসলেন। হেসে বললেন—দিদি, এ তুই কি করলি? হার মেনে মাঝপথে ভেঙে পড়লি? ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে তুই এত বড় লজ্জা দিলি? তোকে এমন ক'রে মানুষ ক'রে তুললুম, তা'র কোনো দামই দিলিনে?

নিরু স্পষ্টকণ্ঠে বললে, তুমি কী বলতে চাও, দাত্থ?

দাত্থ বললেন, বলতে চাই মার খেয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে তোরা শুধু কাঁদতেই শিখেছিস, পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে শিখিসনি!

নিরু আবেগের সঙ্গে বললে, দাত্থ—?

দাত্থ বললেন, হ্যাঁ—জোর ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বল্, এ আমি স্বীকার করবনা! বল, তোর ভেতরে রয়েছে আগুন, রয়েছে ঝড়, রয়েছে বন্যা! বল্, ভাগ্যকে মান্‌ব না, শাসনকে ভয় করব না, বাঁধনের কাছে ধরা দেবো না! বেঁচে ওঠ্, অস্থির হয়ে জেগে ওঠ—মনের দারিদ্র ঘুচিয়ে দে, দিদি!

নিরু কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমাকে তুমি কি করতে বলো, দাতু ?

দাতু উচ্চকণ্ঠে নিরুকে উত্তেজিত ক'রে তোলার জন্যই যেন বললেন, একথা বলবনা, ঘরপোষা মেয়ে তুই ঘরের কোণে নির্জীব হয়ে ব'সে থাক্। একথাই বল্‌ব, হাত পেতে তুই যা পাসনি, কঠিন হাতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আয়! দিদি, জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিসটি পাবার জন্যে মানুষ দূরে চ'লে যায়—ছুটে চ'লে যায়—এ-কি তুই কোনোদিন শুনিসনি ?

নিরু আবেগে থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো—বিহ্বল হয়ে উঠলো!

দাতু তেমনি ব'লে চললেন, কিন্তু তোরা নিতান্ত—নিতান্তই সামান্য মেয়ে! সত্যের জন্যে যুদ্ধ করতে তোরা শিখলিনে, ভালোবাসার জন্যে বিদ্রোহ কর্‌তে সাহস পেলিনে, জীবনে সব চেয়ে বড় যা কাম্য, তাকে পাবার জন্যে তুর্গমের দিকে ছুটলিনে! তোরা সুধুই পোষ মানা শান্তশিষ্ট মেয়ে!

নিরু আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললে, দাতু, এমন কথা—এমন কথা তুমি ত কোনোদিন বলোনি ?

দাতু বললেন, আজকে দরকার হয়েছে তাই বললুম রে। ওরে দিদি, ভালোবাসার পথ স্বর্গেও নয়, স্বপ্নেও নয়—ভালোবাসার পথ সত্যের পথ, ধর্মের পথ!

নিরু বললে, তাহলে—তাহলে তুমি আমাকে এই আশীর্বাদই করো আমার মধ্যে তুমি যা চাও, আমি যেন তার মর্যাদা দিতে পারি। শুধু এইটুকু জানিয়ে আজ তোমার কাছে বিদায় নিলুম, দাতু!—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিরু চলে গেল—দাতু সেইদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে উদ্ভাসিত হাসি হাসতে লাগলেন।

নিরুর ওখান থেকে উত্তেজিত হয়ে ফিরে বেপরোয়ার মতো জিনিসপত্র নিজেই বাঁধা ছাঁদা ক'রে বিশু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। সে যখন ট্রেন-ভ্রমণোপযোগী পোষাক প'রে নিচ্ছে, এমনি সময়ে তা'র কলেজের এক বন্ধু এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, এ কি রে বিশু, দেশে যাচ্ছিস নাকি?

বিশু বললে, দেশে নয় রে, বিদেশে!

বন্ধু সবিস্ময়ে বললে, বিদেশে? কদ্দুরে?

বিশু বললে, আপাতত রাজপুতানা—

বন্ধু বললে, তারপর?

বিশু বললে, তারপর পাঞ্জাবের দিকে—ইচ্ছে আছে!

সে কি রে? সকালে দেখে গেলুম দিব্যি সহজ সুস্থ, এবেলা একেবারে দেশত্যাগী! হঠাৎ সব ভেঙেচুরে গেল যে?

বিশুর মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল, জীবনটা এমনি! হঠাৎই সব ভেঙে চুরে যায়!

বন্ধু সবিস্ময়ে বললে, ও কি বলছিস?

বিশু হাসিমুখে বললে, সুধু খেলা! সুধু খেলাঘর!

নিরুর মোটর ছুটলো দ্রুতবেগে। কলকাতা ছাড়ালো। ক্রমে শহর গ্রামে পরিণত হোলো। মোটর ছুটছে। দূর-দূরান্তর পেরিয়ে চলেছে। ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে। পথঘাট বুঝতে মোটামুটি অসুবিধে নেই। সেদিন রাত কাটলো পথে পথেই। পরের দিন সকাল পেরিয়ে আন্দাজ বেলা এগারোটার সময় যুগলবাবুর বাড়ীর

গেটের কাছে এসে মোটর থামলো। মোটরের ইঞ্জিন বন্ধের একটা আওয়াজ হোলো। নিরু ঝাঁপিয়ে গাড়ী থেকে নেমে কাছারি বাড়ী পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলো। সেই সময় অন্দর মহলের ভিতরে বিপরীত দিক থেকে সূর্যমুখী এদিকে আসছিলেন। নিরু ত্রস্তপদে এগিয়ে এলো। সূর্যমুখী সবিস্ময়ে তাকালেন। এই অপরিচিতা ও সুশ্রী মেয়েটিকে আগে তিনি কখনো দেখেননি। এ বাড়ীতে কেউই দেখেনি।

সূর্যমুখী সবিস্ময়ে বললেন, তুমি কে, মা ?

নিরু বললে, আমি—আমাকে বোধ হয় চিনবেন না।

নূতন একটি মেয়ের আবির্ভাবের কথা বৌরাণীর কানে গেল। তিনি নেমে এলেন। নিরুকে সামনে দেখে, সূর্যমুখীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কে ? কোথেকে আসছ, মা ?

নিরু বললে, কলকাতা থেকে আসছি।—বিশ্বনাথবাবুকে খুঁজতে এসেছি!

সূর্যমুখী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশুকে ?

নিরু একটু থমকে গেল। বৌরাণী বললেন : কোনো দরকার আছে ?

নিরু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশেষ দরকার!—আপনারা কে ?

বৌরাণী ও সূর্যমুখী পরস্পর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁদের জীবনে যে পরস্পরকে এমন একটা অভিনব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—এ তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। কারো মুখ থেকে সহসা বাক্যস্ফুরিত হোলো না।

সূর্যমুখী স্মিতমুখে বললেন, ইনি বিশুর মা।

নিরু বললে, ও, আপনি!

নিরু বৌরাণীর পায়ের ধূলো নেবার চেষ্টা করতেই বৌরাণী বললেন, না, আমি নয়—ইনি!

বৌরাণী সূর্যমুখীকে দেখিয়ে দিলেন—নিরু আগে সূর্যমুখীর ও পরে বৌরাণীর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একবার মুখ তুলে তুজনের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নতমুখে বললে, আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই!

সূর্যমুখী বললেন, কে তুমি মা? বিশুকে কেন?

বিনীতকণ্ঠে নিরু বললে, তাঁর দেখা পেলে তাঁকেই বলতুম!

সূর্যমুখী প্রশ্ন করলেন, এমন কী কথা যা তুমি আমাদের কাছে বলতে পারো না?

নিরু বললে, আপনারা গুরুজন, আপনাদের কাছে কেমন ক'রে বলবো?

বৌরাণী বললেন, বিশুর কাছে তুমি যা বল্‌তে, আমাদের কাছে তা বলবে না কেন?

নিরু বললে, সে-কথা একজনের জীবন-মরণের, আপনাদের কাছে কি বলা চলে?

সূর্যমুখী সবিস্ময়ে বললেন, কার কথা বলছ তুমি?

বৌরাণী প্রশ্ন করলেন, কে সে বলো ত?

নিরু বললে, একটি মেয়ে—আমি তারই জন্যে ছুটে এসেছি!

বৌরাণী ও সূর্যমুখী উদ্বিগ্ন আকুল চক্ষে নিরুর তুই চোখের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁরা যেন কিছু বুঝলেন,—যেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

সূর্যমুখী বললেন, কে সে মেয়ে? কেমন মেয়ে?—যার জন্যে তুমি ছুটে এলে?

নিরু বললে, হ্যাঁ, ছুটে এলুম, ছুটে আসতেই হোলো, ছুটে না এসে উপায় ছিল না!

বৌরাণী একটু বিচলিতভাবে বললেন, এমন করে তুমি কেন বল্‌ছ মা?

নিরু বললে, বলছি—সে মেয়েটির আজ বড় বিপদ !

সূর্যমুখী বললেন, বিপদ !—কি হয়েছে ?

নিরু বললে, আপনাদের কেমন ক'রে বোঝাবো জানিনে। কিন্তু সে-মেয়েটির জীবন, তার ধর্ম, তা'র মনুষ্যত্ব, তা'র ভালোবাসা তার যা কিছু—আজ সবই বিপন্ন !

বৌরাণী বললেন, তুমি—তুমি কি এই কথাই বিশুকে বলতে এসেছিলে ?

নিরু বললে, স্থধু বলতে আসিনি, জানাতে এসেছিলুম।

সূর্যমুখী বললেন, যার কথা তুমি বলতে এলে, সে নিজে এলোনা কেন ?

নিরু বললে, সে এলো না, আবরণ ঘুচিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে সে পারলো না—আমি এসেছি তা'র মন নিয়ে, তা'র প্রাণ নিয়ে !

সূর্যমুখী ও বৌরাণী পরস্পরের প্রতি অভিভূত বিস্ময়ে তাকালেন।

বৌরাণী বললেন, আচ্ছা মা, একটা কথা বলতে পারো—বিশু কি তাকে ভালবাসে ? মানে—সেই মেয়েটিকে ?

নিরু বললে, আমি—আমি সে-কথা বলতে পারবো না। কিন্তু মেয়েটির মনের কথা আমি জানি—ভালো ক'রেই জানি !

বৌরাণী সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চন ক'রে যেন আসল কথা জানতে চাইলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয়, মেয়েটি বিশুকে ভালোবাসে ?

নিরু আরক্ত আলজ্জ নম্রমুখী হয়ে রইলো। যে-নিরুকে যবনিকার অন্তরালে লুকিয়ে রেখে এসেছিল,—সেই নিরুর ভালোবাসার সত্তা তা'র সকল মহিমা নিয়ে এই নিরুর মুখে চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগলো।

বৌরাণী মিষ্ট মৃদুকণ্ঠে বললেন, বলো মা, স্পষ্ট ক'রে বলো !

নিরু তা'র কম্পিত সপ্রতিভ দুটি চোখ তুললো।

বললে, হ্যাঁ, বাসে বৈ কি—নিশ্চয়ই বাসে!

বৌরাণী বললেন, একথা তুমি ঠিক জানো?

নিরু বললে, হ্যাঁ, জানি! সেই জন্যেই ত সে আমায় ছোটালো—এমন ক'রে পথে নামালো।

সূর্যমুখী এতক্ষণ চুপ ক'রে কী যেন দেখছিলেন। এবার বললেন আচ্ছা, বলতে পারো মা—বিশু কি তা'কে কোনো কথা দিয়েছে?

নিরু বললে, কিসের কথা বলছেন?

সূর্যমুখী বললেন, ওরা কি স্থির করেছিল, দুজনের বিয়ে হবে?

নিরু বললে, তা জানিনে, কিন্তু দুজনে ঠিক করেছিল জীবনে কোনোদিন কোনো কারণেই ওদের ছাড়াছাড়ি হবে না!

সূর্যমুখী স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, কিন্তু এবার যে তাই হবে মা!

নিরু বললে, না না, তা হ'তে পারে না, হ'লে চলবে না—আমি সেই কথাই বলতে এসেছি—বোঝাতে এসেছি।

বৌরাণী বললেন, তুমি কি এই কথা বোঝাতে এসেছো, বিশু তা'র মায়ের অবাধ্য হোক, মায়ের সত্য সে মিথ্যে ক'রে দিক্?

নিরু এতক্ষণে সূর্যমুখীর দিকে তাকিয়ে বিশুর মাকে চিনতে পারলো। বললেঃ আপনার সত্য মিথ্যে হোক—এ আমি চাইনে, কিন্তু মা হ'য়ে আপনিই কি চান্ একটি মেয়ের জীবন এমনি ক'রেই মিথ্যে হয়ে যায়?

সূর্যমুখী বললেন, না, তা চাইনে, চাইতে পারিনে। কিন্তু বিশুর জন্মের আগে যে-কথা স্থির হয়ে আছে, তাকে ভাঙতে এসে তুমি ভুল করেছ!

নিরু অবরুদ্ধকণ্ঠে বললে, হয়ত ভুল করেছি—হয়ত ভালোবাসা ভুল করে!

বৌরাণী এবার সস্নেহে বললেন, ভালোবাসায় ভুল ঘটলে এ-জীবনে তা'র প্রতিকার নেই, এ কি তুমি জানতে না?

নিরু বললে, এ ভালোবাসা ভুল, এই আপনি বলেন?

বৌরাণী বললেন, যে ভালোবাসায় মায়ের আশীর্বাদ থাকলো না, থাকতে পারলো না—সেই ত ভুল!

নিরু বললে, ভুল যদি হয়েই থাকে, তাকে টেনে তুলে মা আশীর্ব্বাদ করবেন না, মা কি এতই কঠিন? তাঁর মন কি এতই কঠোর?

সূর্য্যমুখী প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলতে চাও, মা?

নিরু বললে, বলতে চাই যে-দুটো জীবন ভালোবাসার মহিমায় গৌরবে আনন্দে ভরে উঠেছে—তারা যদি আজ ভেঙে পড়ে—তবে কি আপনাদের সেই খেলাঘরের সত্যটাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?

সূর্যমুখী এবার যেন সহসা অভিনব আবিষ্কার ক'রে ব'লে উঠলেন, যেন—যেন মনে হচ্ছে তুমি নিজের কথাই বলছ।

বৌরাণী বললেন, তবে কি এসব তোমারই কথা? তুমিই কি সেই মেয়ে?

নিরু বললে, এ আমার কথা, এ তা'র কথা, এ সব মেয়ের কথা।

বৌরাণী বললেন, তবে কি ছুটে এসেছিলে তুমি তোমারই জন্যে?

এমন সময় সহসা বিপরীত দিক থেকে দাদু, বিশুর বন্ধু ও বিশু তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকলো। সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়।

দাদু গলা ঝাড়া দিয়ে হাসিমুখে বৌরাণীর কথার সূত্র ধ'রে বললেন, না, ঠিক তা নয়—

সকলে সচকিত বিস্ময়ে তাকালো।

দাদু বললেন, মানে কথাটা কি জানেন?—একটু ভুল হোলো। যার জন্যে ছুটে এসেছে, তাকে নিয়ে আমিই এলুম ছুটতে ছুটতে। কি দিদি, তাই না?

নিরু বিমূঢ়ের মত শুধু বললে, দাছ—

বিশু নিরুকে এখানে দেখে হতবাক্। কিছুক্ষণ পরে শুধু বললে, একি—তুমি এখানে ?

বৌরাণী সস্নেহে ডাকলেন, বিশু ?—

সূর্যমুখী এগিয়ে এসে বললেন, কোথা গিয়েছিলি ?

বিশুর বন্ধু এবার হাসিমুখে বললে, বেশীদূর নয় মা—ওর দৌড় ছিল লিলুয়া পর্যন্ত—ফিরিয়ে এনেছি !

দাছ হাসিমুখে একবার সূর্যমুখী আর বৌরাণীর দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, আমাকে বোধহয় চিনতে দেরী হচ্ছে ! আমি সেই চিরকেলে যাছকর ! যেখানে মেলেনা সেখানে মিলিয়ে দিই, যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে মিলন ঘটাই, যেখানে ধরা দেয় না সেখানে বাঁধন দিয়ে দিই !—আর একটু বলবো ?—খেলা ভেঙে দিই, আবার সেই খেলা জমিয়ে তুলি—সেই খেলায় সবাই যখন মেতে ওঠে, আমি কৌতুক নিয়ে থাকি চোখের আড়ালে—আমি যে প্রজাপতি !

একটু থেমে দাছ আবার বললেন, দাঁড়ান সবাই—আরো একটু বিস্ময় হাতে রেখেছি। কই গো মা ?

সহসা আর একদিক থেকে সুরবালা ও যতীনবাবু প্রবেশ করলেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল নিরু বলে উঠল, একি—মা—বাবা—!

দাছ হো হো করে হেসে উঠলেন।

সূর্যমুখী অপার বিস্ময়ে বললেন, সই—সই—ও মেয়ে তোমার ?

যতীনবাবু দাছর দিকে ফিরে বললেন, এসব কি তবে আপনারই ?—

অসহ্য আনন্দে নিঃশব্দে নিরু সকলের চোখের অন্তরালে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

দাছ হো হো করে হেসে উঠলেন।

ওদিকে নায়েবমশাই চোরের মতো পা টিপে টিপে চুপি চুপি প্রবেশ করলো।

নায়েবমশাই বললেন, হেঁ হেঁ এসে পড়লুম চুপি চুপি—এই যে—কুটুম্বরাও এসেছেন দেখছি—তাহলে রাণীমা—এই সঙ্গে যা হোক করে মিষ্টি মুখও হয়ে যাক্—হেঁ হেঁ—যাই চুপি চুপি। নায়েবমশাই দৌড়ে চলে গেলেন।

বৌরাণী হেসে উঠে বললেন, ছোট বৌ, মেয়ে তোর পালালো কোথায়?

দাদু বললেন, কোথাও পালায়নি—আড়ি পেতে আছে!

কই—বিশুর হাত ধরে তিনি বলে উঠলেন, এই যে—যাও ত বাপু—তাকে খুঁজে আনোগে—এবার তোমারই যাবার কথা!

বিস্ময়ে বিহ্বল বিশুর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে তিনি আবার বললেন—যাও, যাও শিগগির বরবেশ ধারণ ক'রে গান্ধর্বমতে মেয়েটাকে টেনে আনো। যাও—।